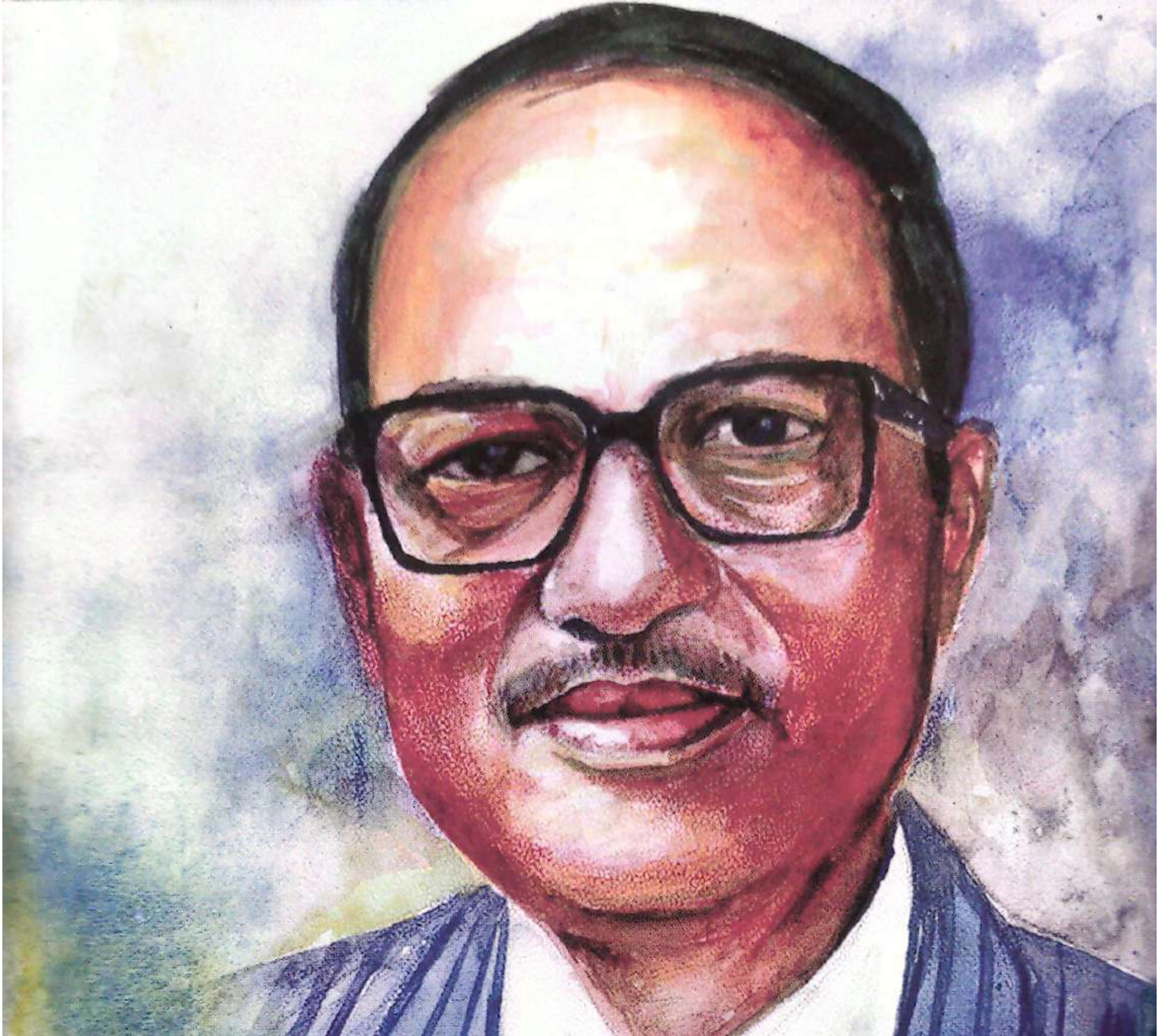

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

তাঁকে যেমন দেখেছি

ডা. প্রবীর কুমার দাশ

জাতীয় অধ্যাপক
ডা. নুরুল ইসলাম
তাঁকে যেমন দেখেছি

CENTRAL LIBRARY
Acc No. 12980
Date.................
USTC * 1992

ডা. প্রবীর কুমার দাশ

এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি (কার্ডিও), এফএসিসি (ইউএসএ)

জাতীয় অধ্যাপক
ডা. নুরুল ইসলাম
তাঁকে যেমন দেখেছি

Author

Dr. Prabir K. Das

MBBS, FCPS, MD (Cardio), FACC (USA)

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

Year of publication : February, 2016

প্রকাশক

প্রিয়ঙ্কর পাবলিশার্স

৯৬, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

Publisher

Priyankar Publishers

96, Panchlaish R/A, Chittagong, Bangladesh.

গ্রন্থস্বত্ব

প্রিয়ঙ্কর ও তীর্থঙ্কর

প্রচ্ছদ

রাশেদ মাহমুদ

সূচারু স্বর্গ, ঢাকা।

প্রোডাকশন

আইকো, ১ সিডিএ বা/এ, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মূল্য

১৫০ টাকা

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত, প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই কিংবা তার অংশবিশেষ ছাপানো বা ফটোকপি করা নিষেধ।

উৎসর্গ

আমার সকল শিক্ষকদের -
যাঁরা আমাকে সত্যসন্ধানী হতে শিখিয়েছেন

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- ▶ সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ হার্ট - ১৯৯৯
- ▶ উচ্চ রক্তচাপ-প্রতিকার ও প্রতিরোধ - ২০০৪
- ▶ দিবসের ডাক - ২০০৮
- ▶ বাংলা থেকে ব্যাঙ্গালোর - ২০১০

লেখকের কথা

এই বইয়ের লেখাগুলো ইতোপূর্বে চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো বই আকারে বের করে আরো বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস বিভিন্নভাবে বিলম্বিত হয়েছে। অবশেষে তা করতে পেরে স্বস্তিবোধ করছি।

জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম আমার শিক্ষাগুরু এবং চিকিৎসা পেশার অন্যতম পথপ্রদর্শক। এই বিশাল মহীরুহের সর্বাঙ্গীন প্রকাশে আমার এই গ্রন্থটি নিতান্তই অপ্রতুল। ইসলাম স্যারের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগে উনার যেটুকু আমার চোখে ধরা পড়েছে তা-ই প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আমার দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় তাঁর অনেক দিক হয়তো রয়ে গেছে অনাবিস্কৃত। আর প্রকাশের সীমাবদ্ধতাও হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পরিপূর্ণতা দানে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। সেজন্য ইসলাম স্যারের বিদেহী আত্মার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সম্মানিত পাঠকগণও তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন- এই কামনা করি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছাড়াও এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের নিজস্ব জবানবন্দিতে উদ্ধৃত কিছু কিছু অংশ তাঁর লেখা গ্রন্থ 'জীবন স্রোতে' এবং 'কিছু ভাবনা' থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন যে এই বইয়ের বিভিন্নস্থানে হৃদয় উৎসারিত আবেগ মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধিভিত্তিক সত্তাকে বহুদূর পিছনে ফেলেছে।

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে বইটি ভূমিকা রাখবে এবং পাঠকনন্দিত হবে - এই আশা করি।

বিনীত
লেখক

CENTRAL LIBRARY
Acc. No. 12980
Date
USTC * 1992

সূচিপত্র

অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ও আমি	৭
প্রথম দেখা	৯
একজন সফল চিকিৎসা বিজ্ঞানী	১২
আদর্শ শিক্ষক ইসলাম স্যার	১৭
সময়ানুবর্তিতা	২০
স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বপ্নের রূপকার	২২
উপস্থাপনা ও প্রকাশনা	২৬
ইসলাম স্যারের রসবোধ	২৯
ছুটির দিনে	৩৩
চঞ্চল প্রেমিক, একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক	৩৭
শেষ দেখা	৪১
যখন রোগশয্যায়	৪৩
অন্তিম শয়ানে	৪৬

অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ও আমি

"যে প্রাণশক্তি জন্মের ঘাট হইতে মৃত্যুর ঘাটে আমাদের পৌঁছায়ে দেয় আমরা তার চেয়ে বড় পাথেয় নিয়ে জন্মেছি। সেই পাথেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অমৃত লোকে উত্তীর্ণ করে দেবার জন্য। যারা কেবল প্রাণী মাত্র মৃত্যু তাদের কাছে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যু শেষ কথা নয়।..জীবলোকের উর্ধ্বে আধ্যাত্মলোক আছে। যে কোন মানুষ এই কথাটি নি:সংশয়ে বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।" সুকুমার রায়ের মৃত্যুতে লেখা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আপ্তবাক্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

২০১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে চেম্বার শেষে বাসায় ফিরে ড্রয়িংরুমে টেলিভিশনের সামনে বসতেই সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদের দিকে আমার দৃষ্টি নিবন্ধ হলো। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম আর নেই । রাত ৯-৪০ টায় ৮৫ বছর বয়সে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। পরিসমাপ্তি ঘটলো এক বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের। সেদিন বিকেলে চেম্বারে রোগী দেখার সময় হঠাৎ অসুস্থবোধ করাতে তাঁকে ঢাকায় বাসার নিকটস্থ একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ উনি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে বাইপাস অপারেশন করা হয়েছিল আগেই। আর স্ট্রোকের পর মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখতে ঢাকাস্থ সিএমএইচএ অপারেশন করেছিলেন আমেরিকান নিউরোসার্জন ডা. এস. সাহা। দু'দুটো বড় অপারেশন থেকে সেরে উঠে তিনি মোটামুটি সুস্থ ও সচল ছিলেন। প্রাত্যহিক কাজ চলছিল যথারীতি। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তিনি ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসার দোতলায় চেম্বারে রোগী দেখেন।

৮৫ বছর বয়সের মৃত্যু অবশ্যই পরিণত বয়সের মৃত্যু। তবে কিছু মৃত্যু আছে যার শূন্যতা কখনও পূরণ হয়না। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম স্যারের মৃত্যুও এ ধরনের একটা শূন্যতা সৃষ্টিকারী মহাপ্রয়ান। একজন সফলকাম ব্যক্তি

তাঁর বহুবিধ সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। রেখে গেছেন তাঁর অসংখ্য অমর কীর্তি। তাই ইসলাম স্যারের মৃত্যু সংবাদ সেই মুহূর্তে আমাকে তেমন বিচলিত করেনি। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সফল পরিসমাপ্তির এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক মেনে নিয়ে প্রয়াত ইসলাম স্যারের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে রাতে শুয়ে পড়ি।

পরদিন খুব ভোরে সাতকানিয়া আমার গ্রামের বাড়ীতে এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে সপরিবারে চট্টগ্রাম শহর থেকে রওনা হলাম। পথে ইসলাম স্যারের গ্রামের বাড়ী চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর। ডা. নুরুল ইসলামের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রাম। এখানেই গাছবাড়িয়ার নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র স্কুল, যেখানে কেটেছে তাঁর স্কুল জীবন। এসব ভাবনা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করল। তারপর একসময় বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। বাড়ীর প্রবেশ পথে যখন আমার বাবার শ্মশানের কাছে দাঁড়ালাম তখন আমি আর নিজেকে সংবরন করতে পারলাম না। আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। গতরাতের আমি আর আজ সকালের আমি- এ দুয়ের মধ্যে যেন কোন মিল খুঁজে পেলাম না। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? /চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?"– মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই শাশ্বত বাণী, কবি রবীন্দ্রনাথ কিংবা ভিক্টর হুগোর মৃত্যু সম্পর্কীয় বাণী- কিছুই আমাকে সান্ত্বনা এনে দিতে পারছেনা। ইসলাম স্যারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমি কাটিয়েছি দীর্ঘ সময়। উনাকে আমি পেয়েছি আমার বাবার চিকিৎসক হিসেবে, ক্লাসে আমার শিক্ষক হিসেবে, হাসপাতালে রোগীর শয্যাপাশে, সেমিনার, সভা, সমাবেশে, বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এমনকি পারিবারিক অনুষ্ঠানেও। উনার চেম্বারে সহকারী চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি ইসলাম স্যারের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলাম। এই স্মৃতিগুলো বারে বারে মানসপটে ভেসে উঠছে, আমাকে আবেগ তাড়িত করছে । উনার মৃত্যুতে এক বিরাট শূন্যতা ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করল। যে শূন্যতা পুরণ হবার নয় সেটাকে খুঁজে ফেরার মনের আকুতি যেন থামতে চাইছে না।

প্রথম দেখা

১৯৭৬ সালের কোন এক সাপ্তাহিক ছুটির দিন। চট্টগ্রাম শহরের জে, এম, সেন হলে এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ঢাকা থেকে। তখন অবশ্য তিনি জাতীয় অধ্যাপক হননি। হলের প্রবেশ পথে টাঙ্গানো ব্যানারে প্রধান অতিথির নাম দেখে আমি ভেতরে ঢুকলাম। ততক্ষণে সভার আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত। লক্ষ্য করলাম প্রধান অতিথির প্রস্থান পথ বরাবর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী। একজন দাঁড়িয়ে আছেন একটা বুকের এক্সরে ফ্লিম হাতে নিয়ে, অন্য কয়েকজনের হাতে বিভিন্ন ধরনের প্রেসক্রিপশন ও পরীক্ষার রিপোর্ট। সবাই অধীর আগ্রহে আপেক্ষমান। আমিও কৌতূহলী হয়ে তাদের কাতারে শরিক হলাম। স্যুট, টাই পরিহিত ডা. নুরুল ইসলাম সভাস্থলে থেকে বের হয়ে ধীরলয়ে হেঁটে আসছেন। বুকের এক্সরেটা হাতে নিয়ে কি যেন উপদেশ দিলেন। একইভাবে প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্টগুলোও হাতে নিয়ে দেখলেন এবং মৌখিক উপদেশ দিলেন। সঙ্গত কারণে লেখার কোন সুযোগ ছিল না তখন। তারপর তিনি গেইট দিয়ে বের হয়ে গাড়ীতে উঠলেন। এটাই ইসলাম স্যারকে আমার প্রথম দেখা। সেদিনের সেই সভা কী নিয়ে তা আমি জানতাম না। উনি সভায় কী বলেছিলেন তাও জানতে পারি নাই। কিন্তু দেখলাম চলার পথেও তিনি চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারটা সেদিন আমার কিশোর বয়সের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ভবিষ্যত পেশা হিসেবে চিকিৎসা বিদ্যাকে বেছে নিতে তা আমাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। আমি ডাক্তারিতে ভর্তি হলাম। সেই সময় ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় গড়ে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত পঞ্চাশ জনকে পছন্দ অনুসারে ঢাকাস্থ আইপিজিএমআর (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) এ ভর্তি করা হয়। আমার ক্লাস শুরু হবে। ঢাকা রওনা হওয়ার সময় চট্টগ্রাম থেকে তৎকালীন প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক পূর্বতারার সাংবাদিক জামাল উদ্দীন (প্রয়াত), চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব-এর প্রাক্তন সভাপতি আবু সুফিয়ানের উপস্থিতিতে আমাকে পূর্বতারার একটি কপি

হাতে দিলেন এবং ঢাকা গিয়ে তা অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সাহেবকে পৌঁছাতে অনুরোধ করলেন। প্রসঙ্গত: জামাল সাহেব এক সময়ে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তখন চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি ছিলেন নুরুল ইসলাম স্যার। আমার ক্লাস শুরু হয়েছে। হোস্টেলে তখনও উঠতে পারিনি। ঢাকা শহরে থাকার মতো অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। অগত্যা বুয়েটের আহসান উল্লাহ হলে আমার বাল্যবন্ধুর (বর্তমান পিডিবি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর কান্তি দাশ) সাথে ডাবলিং। আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল)-এ ক্লাস চলছে। অফিসে খবর নিয়ে জানতে পারলাম অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম এ মুহূর্তে পি.জি হাসপাতালের পরিচালকের দায়িত্বে নেই। তদানিন্তন সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছে। অবশ্য তখন তিনি এই সরকারী অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট করেন। মামলার শুনানি চলছে। অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম পি.জি হাপাতালের পরিচালকের পদে নেই জেনে মনক্ষুণ্ন হলাম। মনে হলো চট্টগ্রাম থেকে এতদূরে ঢাকার আইপিজিএমআর-এ পড়তে আসার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হলো। আমি পূর্বতারার কপিটা হস্তান্তর করতে রিক্সাযোগে বন্ধু প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে বুয়েট থেকে রওনা হলাম ইসলাম স্যারের বাসা ধানমন্ডির উদ্দেশ্যে। ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে উনার চেম্বার ও বাসা দুটোই। এই বাড়ীটা অত্র এলাকার সবাই চেনে। খুঁজে পেতে তেমন বেগ পেতে হলোনা। যখন আমি রিক্সা থেকে উনার বাড়ীর সামনে নামছি তখন দেখলাম উনি গাড়ীতে উঠছেন। কথা বলার সুযোগ হলো না। তাই পত্রিকার কপিটা কেয়ারটেকারের হাতে দিয়ে বিদায় নিলাম। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের রায়ে অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম তৎকালীন পি.জি হাসপাতালের পরিচালক পদে পুনর্বহাল হয়েছেন। তাঁকে ইতোপূর্বে দেয়া বাধ্যতামূলক অবসরকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আবার পি.জি হাসপাতালের পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন। বস্তুত: পি.জি হাসপাতালের সাথে তাঁর ছিল নাড়ির সম্পর্ক। তিনিই ইন্‌স্টিটিউট অব্ পোস্ট গ্রেজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর) এবং পি.জি হাসাপাতালের স্বপ্নদ্রষ্টা। এটা শুরু হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে স্বল্প পরিসরে। তিনিই তা শাহবাগে নিয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করেন। তৎকালীন হোটেল শাহবাগকে পি.জি হাসপাতালে রূপান্তর করেন। তাই লন্ডনের রয়েল কলেজ অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (ডা.) নুরুল ইসলামকে আইপিজিএমআর এর প্রতিষ্ঠাতা (founding father) হিসাবে আখ্যায়িত করে। পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ফিরে আসাতে পি.জি হাসপাতালের চিকিৎসক, শিক্ষক, কর্মচারী সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি অদূর ভবিষ্যতে উনার সান্নিধ্য লাভের আশায় রইলাম। স্বল্পসময়ের মধ্যে সে সুযোগও এসে গেল। আমি যখন ৩য় বর্ষ এমবিবিএস এর ছাত্র তখন আমাদের ক্লিনিক্যাল টিউটর অধ্যাপক (ডা.) মাহমুদ

হাসান (বর্তমান বিএমএ সভাপতি) আমি ও আমার আর এক সহপাঠি মাহবুবা (বর্তমানে গাইনির সহযোগী অধ্যাপিকা)- এই দু'জনকে ইসলাম স্যারের ইউনিটে ওয়ার্ড ক্লিনিকস্ এর জন্য পদায়ন করেন। মেডিসিন বিষয়ে প্রথম পাঠ অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম এর মতো ব্যক্তিত্বের হাত ধরে হতে যাচ্ছে। আমি খুব উৎফুল্ল বোধ করছি। তাঁর রোগী দেখার স্টাইল, পড়ানোর নিয়মকানুন - সবই স্বকীয়তাপূর্ণ ও অনুকরণীয়। আমি তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। সপ্তাহখানেক কেটে গেল পর্যবেক্ষণে। একদিন ইসলাম স্যার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওয়ার্ডে ঢুকে প্রথম কি চোখে পড়ে'? আমি উত্তর দিলাম, 'রোগীর অঙ্গভঙ্গি'। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'অঙ্গভঙ্গি দেখে কি কি রোগ সনাক্ত করা যায়'? আমদের তখন সবেমাত্র ওয়ার্ড ক্লিনিকস্ শুরু। তবে উত্তর যা দিয়েছি তাতে তিনি সন্তুষ্ট মনে হলো। স্যারের সাথে ওয়ার্ড রাউন্ডে ছিলেন তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক (ডা.) নাসিম আক্তার (বর্তমানে মেডিসিনের অধ্যাপক), সহকারি রেজিস্ট্রার ডা. জোয়ারদার, দু'জন ইন্টার্নি ডা. আজাহার (পরবর্তীতে অধ্যাপক) ও ডা. খালিদ। দু'জনই ময়মনসিংহ মেডিকেলে প্রথম স্থান অধিকার করে পি.জি তে ইন্টার্নিশীপ ট্রেনিং এর সুযোগ পান। সে সময়ে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারীগণ পি.জি হাসপাতালে ইন্টার্নিশীপ ট্রেনিং এর জন্য মনোনীত হতেন। ওয়ার্ড রাউন্ডে ইসলাম স্যার প্রশ্ন করা শুরু করতেন যারা সর্বকনিষ্ঠ তাদের দিয়ে। তারপর জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে অন্যদেরকে। একদিন ইসলাম স্যার আমাদের দু'জনকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। দু'জ'ন দু'রকম উত্তর দিলাম। তিনি কোনটাই নাকচ না করে অন্যদের একে একে জিজ্ঞাসা করলেন, 'who is correct? he or she'। সবাই বললেন, 'he'। কেবল একজন বললেন, 'she'। ইসলাম স্যারের রসিকতাভরা মন্তব্য, 'মহিলা বলে আপনি কি তাকে favour করছেন'? উনার ছিল সুক্ষ্ম রসবোধ। শত ব্যস্ততার মাঝেও তা প্রকাশ করতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। বস্তুত: আমার উত্তরটাই সঠিক ছিল। তা তিনি প্রকাশ করলেন এভাবেই। ডা. নাসিম উনাকে বললেন, স্যার, 'প্রবীরের বাড়ী চট্টগ্রাম'। চট্টগ্রামের প্রতি উনার দুর্বলতা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি আমার গ্রামের বাড়ী সম্পর্কে অবগত হলেন। ইসলাম স্যারের ব্যক্তিত্ব, ক্লাস ও ওয়ার্ডে ছাত্রদের শিক্ষাদান, রোগীদের চিকিৎসাদানের স্বকীয়তা ও দক্ষতা আমাকে মেডিসিনে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। শুধু স্বপ্ন দেখাতেন না, স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথও দেখাতেন। তাই উনার সাহচর্যে যারা এসেছেন তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

একজন সফল চিকিৎসা বিজ্ঞানী

জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ছিলেন একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। তবে তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি একজন সফল চিকিৎসা বিজ্ঞানী। নিজস্ব মেধা ও স্বকীয়তা আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলনীতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে উনাকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে আমি পিজি হাসপাতালে ইন্টার্নিশীপ শেষ করে অবৈতনিক মেডিকেল অফিসার হিসাবে মেডিসিন বিভাগে কর্মরত। মেডিসিন বিষয়ে আমার আগ্রহ শুরু থেকেই। তা অনেকাংশে ইসলাম স্যারের কারণে। একদিন পি.জি. হাসপাতালে কর্মরত সহ-রেজিস্ট্রার চট্টগ্রামের ডা. আহমদ হোসেন (প্রয়াত) আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি সহকারী চিকিৎসক হিসাবে ইসলাম স্যারের চেম্বারে বিকেলে কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা। আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম। ইসলাম স্যারের প্রাইভেট চেম্বারে রোগীর ভীড় লেগেই থাকে। তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন দেড় থেকে দুই মাস পর্যন্ত। প্রতিদিন এই ভিড় সামলে চেম্বার ম্যানেজ করতে হিমশিম খেতে হয় দুইজন সহকারী চিকিৎসক ও চেম্বারে কর্মরত কর্মচারীদের। আগত ও অপেক্ষমান রোগীর সংখ্যা যত বেশিই হোক উনি একবারে একজনের বেশি রোগীকে কনসালটেশনের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। এমনকি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে রোগীর সাথে কোন আত্মীয়-স্বজনকেও নয়। রোগীর কষ্টের কথা যাতে রোগী নিজে পুরোপুরি বলতে পারেন-যেখানে থাকতে পারে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ও, তা তিনি নিশ্চিত করতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই নীতি তিনি অনুসরণ করতেন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে। চেম্বারে ঢুকেই রোগী দেখতে পেতেন সাদা এপ্রোন আর টাই পরিহিত ডা. নুরুল ইসলাম সাহেব চেয়ারে আসীন। সামনে রোগীর চেয়ার, চারিপাশে বুক সেল্‌ফে থরে থরে সাজানো রেফারেন্স বই ও বিভিন্ন প্রকাশনা। অধিকাংশ নিজের লেখা, কিছু অন্যান্য লেখকের। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে

কখনও কার্পণ্য করতে তাঁকে দেখিনি। কাজের চাপ কিংবা শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে যখনই মনোযোগে ঘাটতি দেখা দিত তখনই তিনি রোগী দেখা স্থগিত করতেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্জনদের মতামত নিতে পিছ্পা হতেন না। তাদের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেন। কখনও দেখতাম তিনি রোগীর সামনেই রেফারেন্স বই কিংবা প্রকাশনা খুলে বসতেন। কোন ধরনের সন্দেহ যাতে চিকিৎসা বিভ্রাটের কারণ না হতে পারে - এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতেন। কখনও কোন বিশেষ ওষুধের মাত্রা, বিধি নিষেধ ও তার মিথষ্ক্রিয়া বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বৃটিশ ন্যাশনাল ফরমুলারী (বিএনএফ) খুলে দেখে নিতেন। রোগের প্রকৃতি বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোন চিকিৎসা দিতেন না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর ব্যাপারেও একই নীতি মেনে চলতেন। সম্ভাব্য স্বল্প পরীক্ষা আর স্বল্প ওষুধে চিকিৎসা - এ ছিল তাঁর চিকিৎসার বিশেষত্ব। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিনব কিংবা নতুন কিছু দিক এলে তা বই ও প্রকাশনা থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দেখে নিতেন। এভাবে নিজের জ্ঞানকে হালনাগাদ রাখতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে না করলে কখনও কোন ওষুধ লিখতেন না। ঘুমের ওষুধ কিংবা শারীরিক দুর্বলতা কাটানোর ওষুধ লিখতেন কদাচিৎ। যাদের ওষুধের প্রয়োজন নেই মনে করতেন তাদের ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিতেন 'no medicine'। এ ধরনের রোগী কখনওবা বলতেন, 'স্যার, বছর দু'য়েক আগে আমাকে একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, এখনও যদি অনুগ্রহপূর্বক একটা ওষুধ দেন'। ইসলাম স্যারের জোরালো যুক্তি, 'এ দু'বছরে আমার জ্ঞান নিশ্চয়ই কমেনি। আপনার ওষুধের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন'। ওষুধ চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর ব্যবস্থাপত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের নির্দেশনা থাকতো জোরালোভাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও।' উনার চেম্বারের রোগীর অবস্থান কক্ষে এ কথাটা লেখা ছিল। একসময়ে তিনি নিজে ধূমপায়ী ছিলেন। নিজে ধূমপান বিসর্জন দেন। গড়ে তোলেন ধূমপান বিরোধী সংগঠন আমরা ধূমপান নিবারন করি (আধূনিক)। জীবনযাত্রার অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে ধূমপান বর্জন তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রের অন্যতম দিক। বস্তুত: ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ছাড়াও প্রায় সব রোগের সাথে ধূমপানের সম্পর্ক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ধূমপায়ী রোগীদের বিভিন্নভাবে তাগাদা দিতেন এই বদভ্যাস পরিহার করতে। ধূমপানের পিছনে ব্যয়িত অর্থ কোন ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে ব্যয় করে পুণ্য সঞ্চয় করতে ধূমপায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। ধূমপায়ী যারা ধূমপান বন্ধ করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আধূনিকের পক্ষ থেকে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে পুরস্কৃত করতেন। আর যারা উনার পরামর্শ ও নির্দেশনা মেনে চলতে অপারগ হতেন তাদেরকে সংক্ষুব্ধ হয়ে বলতেন, 'সিগারেট বন্ধ করুন নতুবা সিগারেটের আগুনে আমার এই প্রেসক্রিপশন পুড়ে ফেলুন'। এরপর ধূমপায়ী রোগী ধূমপান বন্ধ করে

দিতে বাধ্য হতেন। আবার কোন কোন ধূমপায়ী হয়ত তাদের এই বদভ্যাসের কথা অস্বীকার করতেন। তিনি তাদের পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে নিতেন হাতের আঙ্গুলে নিকোটিনের দাগ ও গন্ধ কিংবা পকেটে সিগারেট ও দিয়াশলাই আছে কিনা। এ ধরনের কারো কারো পকেট থেকে বের করে আনা সিগারেট ও দিয়াশলাই টেবিলের উপর জমা করতেন। অন্য ধূমপায়ী রোগীরা তা দেখে সতর্ক হতেন, ধূমপান বন্ধে সচেষ্ট হতেন। এভাবে রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতন করতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন। একদিন phobic neurosis (অস্বাভাবিক ভীতি)-এ আক্রান্ত জনৈক রোগী রাজশাহী থেকে এসেছিলেন ইসলাম স্যারের কাছে চিকিৎসার জন্য। মানসিক ভীতি তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে উনি ঘর থেকে একাকী বের হতে পর্যন্ত পারতেন না। সামাজিক কোন আচার অনুষ্ঠানে যেতে ভয় পেতেন। স্নায়বিক দুর্বলতা কাটানোর ওষুধ সেবন করে যাচ্ছেন অনেকদিন যাবৎ কিন্তু উন্নতি হচ্ছেনা। ইসলাম স্যার উনাকে কোন ওষুধ দিলেন না। উনার সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বা সাইকোথেরাপি দিয়ে তাকে পাঠালেন চেম্বারের অদূরে নিউমার্কেট কাঁচাবাজার থেকে লেবু কিনে আনতে। ইসলাম স্যার উনাকে জোরালোভাবে আশ্বস্থ করলেন। উনি একাই রওনা হলেন। কিছু সময় পরে দেখা গেল তিনি ঠিকই সেই কাজটি করে এসেছেন। তিনি বিগত কয়েক বছর যাবৎ অন্যের সহায়তা ছাড়া রাস্তায় বের হতে পর্যন্ত পারেননি। পরবর্তীতে এই রোগীর মনোবল এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে তিনি ওষুধ ও অন্যের সাহায্য ছাড়াই চলতে সক্ষম হন।

ইসলাম স্যারের চেম্বারে চিকিৎসা নিতে আসতেন অগণিত রোগী। ধনী, গরিব, বাচ্চা, বুড়ো, অতি সাধারণ ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভিআইপি নির্বিশেষে সকলেই। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী চট্টগ্রাম থেকে আসা। চট্টগ্রামের রোগীদের সুবিধার্থে থাকত বিশেষ কিছু ব্যবস্থা। একজন ভিক্ষুককে দেখতাম মাঝে মাঝে চেম্বারে এসে ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধ নিয়ে যেতে। আবার ভিআইপি যারা তাদের অপেক্ষমান সময় কমাতে ব্যবস্থাপত্রে লেখা থাকতো 'সরাসরি'। মাঝে মাঝে বাবা মা কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের একান্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী কমবয়সী রোগীদেরও তিনি দেখতে বাধ্য হতেন। আমার দেখামতে ইসলাম স্যারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ রোগী ছিলেন সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সাহেব। নাসির উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আসতেন উনার মেয়ে মাসিক বেগম পত্রিকার সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম (তৎকালীন খেলাঘর সভাপতি রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই এর সহধর্মিনী)। ইসলাম স্যারের কাছে শুনেছি প্রায় দুই যুগ ধরে তিনি নাসির উদ্দীন সাহেবের চিকিৎসা করেন। নাসির উদ্দীন সাহেব তখনই শতবর্ষী। অসুখ তেমন একটি ছিলো না। কেবল বার্ধক্যজনিত কিছু সমস্যা নিয়ে আসতেন মাঝে মধ্যে। ইসলাম স্যারের কাছ থেকে উনার চিকিৎসা নেবার কারণটাও শুনলাম নাসির উদ্দীন সাহেবের মুখেই। তিনি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমার শরীরটা অনেক

পুরানো। এত দিনের ব্যবহারে ক্ষয় হয়েছে অনেক। আপনি নতুন করে চালাবেন কী করে? তবে ছোটোখাটো মেরামত করে কোন রকমে চালিয়ে দেয়া যাবে। বেশি ওষুধ দিলে গন্ডগোল লাগতে পারে। আপনার সামান্য ওষুধে অনেক উপকার পাই বলে আসি। আগে দু'এক জায়গায় গিয়ে দেখেছি আট দশটি ওষুধ দেয়। পেটে অত জায়গা কোথায়? তাছাড়া বিনা প্রয়োজনে নাটবল্টু লাগলে যন্ত্রের গন্ডগোল হবে না'? সদাহাস্য নাসির উদ্দীন সাহেবের এই সরস অথচ বিজ্ঞানসম্মত মন্তব্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইসলাম স্যার উনাকে দেখে ব্যবস্থাপত্র ও সাথে ওষুধ দিয়ে দিলেন। গুণী ব্যক্তিদের উনি সম্মান দেখাতেন বিশেষভাবে। ততক্ষণে ইসলাম স্যারের রোগী দেখা শেষ। নাসির উদ্দীন সাহেবের বাড়ী পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজারে। উনার বক্স ওয়াগন গাড়ীটা শাহবাগ হয়ে যাবে। নাসির উদ্দীন সাহেব আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে শাহবাগ পি.জি হাসপাতালের সামনে ড্রপ করলেন। উনাকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে আমি আমার তৎকালীন আবাসস্থল পি.জি. হোস্টেলে পৌঁছলাম। প্রসঙ্গত ১৯৯৫ সালে নাসির উদ্দীন সাহেবের অন্তিম সময়ে উনাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়। আমি তখন এমডি (কার্ডিওলজী) চূড়ান্তপর্বে অধ্যয়নরত এবং সেখানকার সিসিইউতে কর্তব্যরত। সেদিনই ১০৬ বছর বয়সে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। সিসিইউতে ভর্তির আগ পর্যন্ত তিনি ইসলাম স্যারের দেওয়া ওষুধই সেবন করে যাচ্ছিলেন।

ব্যক্তিগত চেম্বারের বাইরে ইসলাম স্যার পি.জি. হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে রেফার্ড রোগীদের চিকিৎসা দিতেন। ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা হতো পি.জি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ওয়ার্ডে ও বিভিন্ন কেবিনে। ক্লিনিকে যেতেন না পারতপক্ষে। বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির অসুস্থতায় ও কারো কারো বিশেষ অনুরোধে ক্লিনিক কিংবা বাসায় যেতেন কদাচিৎ। এ ধরনের কিছু সাক্ষাৎকারে ইসলাম স্যারের সঙ্গী হতাম আমি। একদিন স্যার আমাকে ডেকে বললেন, চলেন দীনুকে (নিউরো মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. দীন মোহাম্মদ) দেখতে যাই। অধ্যাপক (ডা.) দীন মোহাম্মদ তখন অসুস্থ হয়ে ঢাকায় নয়াপল্টনস্থ এক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। ইসলাম স্যারের স্নেহভাজন ছাত্রদের অন্যতম অধ্যাপক (ডা.) দীন মোহাম্মদ। উনাকে ইসলাম স্যার দেখে চিকিৎসা দিলেন। ফেরার সময়ে ইসলাম স্যারকে ডা. দীন মোহাম্মদের স্ত্রী সম্মানী ফি দিতে চাইলেন। এতে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আমাকে বললেন, 'হয়ত অন্য কোন কনসালটেন্ট দীনুর কাছ থেকে ফি নিয়েছেন। নইলে তার স্ত্রী এ কাজ করতে যাবার কথা নয়'। ইসলাম স্যার কোন চিকিৎসক কিংবা তাদের পোষ্যের কাছ থেকে ফি নিতেন না। তাদের তিনি নিজ পরিবারের একজন হিসাবে গণ্য করতেন। এই নিয়ম তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নি।

নীতিগতভাবে ক্লিনিকে না গেলেও তিনি কারো মানবিক আবেদন অগ্রাহ্য করেন

নি। সাড়া দিতেন এই ধরনের আহ্বানে। একদিন কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকার জনৈক রোগী মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকার এক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যে অনেক কনসালটেন্ট তাকে দেখেছেন। শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রোগীর অবস্থা অবনতিশীল। তার অন্তিম বাসনা- মৃত্যুর আগে ডা. নুরুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে শেষ চিকিৎসা নেবেন। এই মানবিক আবেদন রক্ষা করতে তিনি গেলেন সেই ক্লিনিকে। কাকতালীয়ভাবে আমি সেদিন উপস্থিত হলাম উনার অফিসে। তিনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। রোগী দেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন রোগীর আর্থিক সঙ্গতি নেই। ক্লিনিকের খরচ মেটাতে হিমশিম খাবে। রোগীর লোক উনার সম্মানী ফি আমার হাতে তুলে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইসলাম স্যার টাকাটা আমার হাত থেকে নিয়ে তার অর্ধেকটা রোগীর লোককে ফেরত দেন। রোগীর শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা উনাকে নাড়া দিল। উনি ক্লিনিক থেকে বের হয়ে গাড়ীতে উঠছেন- পাশে রোগীর উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে। তিনি বাকী টাকাটাও রোগীর লোকের হাতে দিয়ে দেন। ইসলাম স্যারের এমন মানবতাবোধের নজির আরো অনেক। আমি হয়ত তাঁর দু'একটার সাক্ষী হতে পেরেছি।

চিকিৎসা এক মহৎ পেশা। যুগে যুগে যারা এই পেশার গৌরব বৃদ্ধি করছেন, এই পেশাকে মহিমান্বিত করেছেন জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সাফল্য ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম স্যারের এবং সামগ্রিকভাবে তা সকল চিকিৎসক সমাজের। তাই ইসলাম স্যারের কাছ থেকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা গ্রহণকারী পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রকাশিত 'মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো' কাব্যগ্রন্থে ডা. নুরুল ইসলামকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন– *'যন্ত্রণা ভরা রুগ্ন শয্যাপাশ /তোমরা আসিয়া এনে দাও আশ্বাস। ....স্বজন বন্ধু যবে কাছে নাহি আসে/ তখনও তোমরা বসিয়া শয্যা পাশে/ নবজীবনের শোনাও আশার বাণী/ মুমূর্ষুজনে অমৃত ফলদানি/ তোমার হস্তে দিয়ে এ ক্ষুদ্র দান/ তব দান তবু রহিল যে অম্লান।'*

আদর্শ শিক্ষক ইসলাম স্যার

আদর্শ শিক্ষক তিনিই যিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। নিজের জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতা তাঁর ছাত্রের মধ্যে যত বেশি সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন শিক্ষক হিসেবে তিনি তত সফল। শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে স্বপ্ন দেখান-বড় হওয়ার স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম তাঁর ছাত্রদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে পথ দেখিয়েছেন। এটাই শিক্ষক হিসেবে তাঁর সফলতা। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি তাঁর শিক্ষক সত্তাকে সামান্যতম ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভাল চিকিৎসক অনেক থাকেন-যারা রোগ নির্ণয়ে পারদর্শী, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ সাড়াতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু চিকিৎসক ও শিক্ষক-উভয় ভূমিকায় যারা সফল তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে অনেকের শিক্ষাদানের দিকটা ব্যাহত হয়। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ছিলেন মেডিসিন বিষয়ের অধ্যাপক। মেডিসিন বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি স্থাপন করে গেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাই উনার অগণিত ছাত্রদের কাছে তিনি প্রিয় ইসলাম স্যার। মেডিকেল শিক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাই ষাটের দশকে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষক তৈরীতে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইনস্টিটিউট অব্ পোস্ট গ্রেজুয়েড মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর) ও পিজি হাসপাতাল। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আইপিজিএমআর- এ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সুবাদে ৩য় বর্ষেই উনাকে আমাদের শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়। ইসলাম স্যার লেকচার ক্লাসে ঢুকতেন ঠিক সকাল ৭টায়। তাঁর লেকচারের বিষয়বস্তুর তথ্যবহুল ও

উপস্থাপনা হৃদয়গ্রাহী। অনেক প্রস্তুতি নিয়ে তা উনি তৈরী করতেন-তা বোঝা যেত সহজেই। লেকচারের বিষয়বস্তুতে পাঠ্যবইয়ের বাইরের অনেক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকতো। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্লাইড কিংবা ওভারহেড প্রোজেক্টর ব্যবহার করতেন। কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা তখনও আসেনি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উনার ক্লাস হৃদয়ঙ্গম করতাম। পুরো এক ঘন্টা কারো মনোযোগে ঘাটতি ঘটতো বলে মনে হতো না। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন উদাহরণ টানতেন। এতে পুরো ক্লাস চাঙ্গা হয়ে উঠতো মুহূর্তের মধ্যে। ক্লাসের শেষের দিকে থাকতো প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সবমিলিয়ে ক্লাস ছিল এককথায় দারুণ উপভোগ্য। কোন প্রশ্নের তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে তা ছাত্রদের মধ্য থেকেই বের করে আনতেন। তা এক অপূর্ব ক্যারিশমা। এতে ছাত্রদের মননশীলতা বৃদ্ধি পেত নিঃসন্দেহে। উনার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ দিক আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে- তা হচ্ছে উনার সূক্ষ্ম রসবোধ। ক্লাসের বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে কৌশলে তিনি রসোদ্দীপক কিছু ব্যাপার বের করে আনতেন সাবলীলভাবে। তা হতো কোনো সামাজিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত এমন কিছু। এতে তাঁর উপস্থাপনা আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো।

লেকচারের পাশাপাশি ইসলাম স্যারের ওয়ার্ড ক্লিনিকস্‌ও ছিল স্বকীয়তাপূর্ণ। এই ক্লিনিকস্‌ চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ, যা রোগ নিরূপণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করে রোগ সনাক্ত করা না গেলে সে জ্ঞান কাজে আসেনা। তা রোগ নিরূপণ কিংবা তার চিকিৎসায় কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে। ইসলাম স্যারের ওয়ার্ড ক্লিনিকস্‌ ছিল বিশেষত্বপূর্ণ। ছাত্রদের তিনি রোগীকে পরীক্ষা করতে দিতেন কিছু নির্দেশনা সহ। একই রোগী সকল শিক্ষার্থী পরীক্ষা করে দেখতেন। রোগের ডায়াগ্‌নোসিস তারা আলাদাভাবে লিখে স্যারকে দেন, যাতে কেউ কারোটা কপি করতে না পারেন। তিনি সেই লিখিত ডায়াগ্‌নোসিস নিজে জমা নিয়ে রাখতেন। তারপর পড়ানোর সময় তা নিয়ে আলোচনা করতেন। এতে প্রত্যেকের জ্ঞান ও রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হতো। এ ধরনের কৌশল ইসলাম স্যারের অনেক ছাত্র (যারা অনেকেই পরবর্তীতে অধ্যাপক হয়েছেন) তাদের ছাত্রদের ওয়ার্ড ক্লিনিকস্‌-এ প্রয়োগ করে থাকেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। এখানেই ইসলাম স্যারের সার্থকতা। তিনি তাঁর শিক্ষা ছাত্রদের মাধ্যমে ভবিষ্যত চিকিৎসকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

শিক্ষক হিসেবে ইসলাম স্যারের ভূমিকা শুধু ক্লাসরুম আর হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তিনি রোগী তথা দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্যশিক্ষা দিয়েছেন। তাদের স্বাস্থ্য সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তা তাঁর চেম্বারে রোগী চিকিৎসায়, চেম্বারের বাইরে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ কাজে তিনি ছাত্র, শিক্ষক,

রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, ধর্মীয় নেতাসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন। 'প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে সর্বদাই উত্তম'- এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তার মাধ্যমে জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক ও প্রাথমিক স্তরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে তিনি জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুস্বাস্থ্যের বার্তা তিনি প্রচার করে গেছেন সারা জীবন। কেবল স্বাস্থ্য শিক্ষা নয়, তিনি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের বারতা প্রচার করছেন বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁর ভাষণ এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে যেমন জাতি সৃষ্টি হয়, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের উপর সমগ্র জাতির সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। সুস্বাস্থ্য বলতে শুধু রোগবর্জিত দেহকে বোঝায় না। শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতাকে বোঝায়।' এভাবে তিনি শারীরিক সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সামাজিক সুস্বাস্থ্যের বার্তা প্রচার করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

ইসলাম স্যারের শিক্ষাকে ধরে রাখতে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে তিনি রেখে গেছেন তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষক হিসাবে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর লেখা গ্রন্থ ও প্রকাশনায়। যুগে যুগে তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর হাতে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁর শিক্ষাকে ধারণ করবে এবং তা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ব্যক্তি ইসলাম স্যারের জীবন্কাল সীমিত। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ কালোত্তীর্ণ। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম তেমনি একজন কালজয়ী শিক্ষক।

সময়ানুবর্তিতা

ইংলিশ কবি ও সাহিত্যিক চার্লস্ ডিকেন্স বলেছেন, 'জীবনে বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য দিতে হবে।' আর স্বাবলম্বী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ স্মাইল্স-এর মতে, 'অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা পূরণ করা যায়, জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম ও ওষুধ দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায়; কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্য চলে যায়।' অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম সদা সচেষ্ট থাকতেন সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে। অন্যান্য অনেকের মতো তাঁর বহুমুখী সাফল্যের পিছনে এই সময়ানুবর্তিতা অন্যতম ভূমিকা রেখেছে। তিনি প্রতিদিন পি.জি হাসপাতলের অফিস গেইট পৌঁছাতেন সকাল ৭টার মধ্যে। ছুটিতে না থাকলে তার ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। ক্লাস, সভা, সমাবেশ, যে কোন সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ের পরে উনার পৌঁছানোর নজির নেই। ১৯৯১ সালের এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঢাকার গুলশানে জিরাজ আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইসলাম স্যার সভাপতিত্ব করবেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত সাইফুর রহমান সাহেব ছিলেন প্রধান অতিথি এবং ঢাকাস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত বিশেষ অতিথি। ইসলাম স্যার আমি ও আরো কয়েকজনকে সাথে নিলেন সঙ্গী হিসেবে। আমরা উনার ধানমন্ডির বাসা থেকে রওনা হয়ে নির্ধারিত সময়ের অনেকটা আগেই অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তখনও অভ্যাগতদের কেউ অনুষ্ঠান স্থলে এসে পৌঁছাননি। নিমন্ত্রণপত্রে অনুষ্ঠান শুরুর সময় উল্লেখিত ছিল বিকেল ৫.০০ ঘটিকা। ইসলাম স্যার আমাদেরকে নিয়ে ঠিক ৪.৪৫ ঘটিকায় সেখানে পৌঁছে গেলেন। তাঁর সময়ানুবর্তিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তা তিনি বজায় রেখেছেন সারাজীবন।

'সময়ের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি'- এটা সর্বজনবিদিত পুরোনো প্রবাদ। ইসলাম স্যারের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ছিল সময়ের চেয়ে জীবনের দাম বেশি হলেও যে ব্যক্তি সারা জীবন বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয় তার জীবনের কোন দাম

নেই। এভাবেই তিনি সময়কে মূল্য দিতেন। আবার বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত এই তিন সময়ের মধ্যে বর্তমানকেই তিনি বেশি মূল্য দিতেন। তিনি ছিলেন কর্মবীর। তাই অতীত নিয়ে পড়ে থাকতেন না। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যত বিনির্মাণে তিনি ব্রতী ছিলেন। ১৯৯১ সালের জুন মাসে আমি সহকারী রেজিষ্ট্রার হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত। এক শুক্রবার ইসলাম স্যার আমাকে উনার পরিচালনাধীন জনসেবা ফাউন্ডেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ঢাকার মীরপুরস্থ ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ'-এই বিষয়ে একটি ক্লাস নিতে বললেন। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডক্টরস্ কোয়ার্টারে অবস্থান করছি। আমার আবাসস্থল থেকে বের হবার মুহূর্তে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম বর্ষণ, থামার কোন লক্ষণ নেই। একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সময়মতো কোনভাবেই বের হতে পারলাম না। ইতিমধ্যে ক্লাসের নির্ধারিত সময় প্রায় অতিবাহিত। ক্লাস নিতে আমার অপরাগতার ব্যাপারটা জানাতে উনার ল্যান্ড ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করলাম। মোবাইল ফোন তখনও আসেনি। শুক্রবার বন্ধের দিন। তাই হয়তোবা উনাকে পাওয়া যায়নি। যখন উনাকে টেলিফোনে পেলাম তখন ক্লাসের সময় অতিবাহিত। তিনি টেলিফোনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আমি ব্যাপারটা আগে কেন উনাকে জানালাম না; উনি আগে জানলে নিজেই ক্লাস নিতে যেতেন। দুরদুরান্ত থেকে ইমামগণ এসেছেন- ক্লাস না হওয়াতে উনি ভীষণ মন:ক্ষুণ্ন। আর পূর্ব নির্ধারিত কোন ক্লাস হবেনা তা তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। যে কোনো প্রতিকূলতার মধ্যেও ক্লাস হওয়া চাই। টেলিফোনে তিনি রাগত:স্বরে কথা বলতে বলতে টেলিফোনের রিসিভার রেখে দেন। আমি ধরে নিলাম তিনি মনে হয় ভবিষ্যতে আমার সাথে আলাপচারিতার সম্পর্কটুকুও আর রাখবেন না। পরদিন সকাল বেলা ভয়ে ভয়ে আবার ফোন করলাম। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ইসলাম স্যারের প্রথম জিজ্ঞাসা- 'প্রবীর, আপনার শরীরটা ভালো?' আমি উনাকে ধন্যবাদ জানালাম। আগের দিনের প্রসঙ্গে আর গেলাম না।

স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বপ্নের রূপকার

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এ.পি.জে আবদুল কালাম বলেছিলেন, 'মানুষ রাতে যা দেখে তা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন সেইটিই যা মানুষকে রাতে ঘুমোতে দেয় না'। ইসলাম স্যার ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নের সার্থক রূপ দিয়ে গেছেন। একসময়ে হাতেগোনা কিছু চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে বিলেতে যেতে পারতেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশেই এই উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করে তা সকল স্তরের চিকিৎসকের জন্য উন্মুক্ত করতে। তার বাস্তবায়নও তিনি করেন। আইপিজিএমআর (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) হচ্ছে এক্ষেত্রে পুরোধা প্রতিষ্ঠান। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৭২ সালে পি.জি. হাসপাতালের একটি কক্ষে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্‌স এন্ড সার্জন্‌স (বিসিপিএস) এর কার্যক্রম শুরু করতে উদ্যোগ নেন। বর্তমানে বিসিপিএস ঢাকার মহাখালীস্থ বিশাল ক্যাম্পাসে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একইভাবে এদেশের ক্রমবর্ধমান চিকিৎসক চাহিদার কথা চিন্তা করে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বেসরকারী পর্যায়ে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। তা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ ছিল চট্টগ্রামে ইন্‌স্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেল্‌থ সায়েন্স (আইএএইচএস) প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলীস্থ পাহাড়ের উপর একটা টিনশেডে তিনি তার কার্যক্রম শুরু করেন। আইএএইচএস এখন ইউনিভার্সিটি অব্‌ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই টিনসেড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফটো সেশনের পর তিনি ক্যামেরাটা নিজ হাতে নিয়ে এদিক সেদিক ফোকাস করে ক্লিক করেন।

১৯৮৯ সালে আইএএইচএস (বর্তমান ইউএসটিসি) এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে প্রথম ব্যাচ এমবিবিএস ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। অন্যান্যদের সাথে অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউনুস, অধ্যাপক ডা. আবু সাঈদ এবং লেখক (পেছনে সর্বডানে)

তখন তিনি বলেছিলেন, 'বিক্ষিপ্ত কিছু ছবি তুলে রাখলাম, ভবিষ্যতের জন্য তা সাক্ষী হয়ে থাকলো।' স্বপ্নের কি অপূর্ব বাস্তবায়ন! আইএএইচএস কে তিনি চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএসটিসি) রূপান্তর করলেন। স্বল্প সময়ে নির্মিত হলো বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালসহ অন্যান্য স্থাপনা। দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগেনি। উদ্বোধনী দিনে উনার তোলা ছবিগুলো তার সাক্ষী হয়ে রইল। তবে এ কাজটা সহজ ছিলনা। তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন নানা প্রতিবন্ধকতার। দেশি বিদেশি কিছু স্বার্থান্বেষী মহল উনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লেগে যায়। তখন সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পাঠকপ্রিয় ছিল। এটাকে তারা কাজে লাগাল। একদিন এই ম্যাগাজিনে কাভার হেডিং করা হলো 'ডা. নুরুল ইসলামের জটিল রোগী আইএএইচএস!' এতে আমিও ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করলাম। ইসলাম স্যারের সাথে দেখা করতে উনার বাসায় গেলাম। উনাকে চিন্তিত মনে হলো। তবে তিনি হাল ছেড়ে দেননি, হতবিহ্বল হয়ে পড়েন নি। একটা প্রতিবাদ লিপি লিখে আমার হাতে দিলেন ইত্তেফাক অফিসে পৌঁছানোর জন্য। আর আমি নিজে - একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে উক্ত সংবাদের প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখলাম দৈনিক অবজারভারের (অধুনালুপ্ত) চিঠিপত্র কলামে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে আইএএইচএস কে ইউএসটিসি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৮২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতি ছিল বিশ্বনন্দিত। এই ওষুধনীতি প্রণয়ন কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন

ওষুধনীতির মাধ্যমে দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানীকে এ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা বহুজাতিক কোম্পানীর একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করতে। তিনি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছেন। বর্তমানে দেশীয় মালিকানাধীন অনেক ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের চাহিদা মিটিয়ে মানসম্মত ওষুধ বাইরের অনেক দেশেও রপ্তানি করছে।

১৯৮৬ সালে ইসলাম স্যারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় সাস্ক (SASC-Student's anti-smoking committee)। এদেশে ধূমপানের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ প্রতিরোধে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। এটাই কালক্রমে ধূমপান বিরোধী জাতীয় সংগঠন 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক)' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ধূমপান ও তামাকমুক্ত যে সুস্থ সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে 'আধূনিক'। ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সরকারীভাবে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং দেশে ধূমপান বিরোধী আইন প্রণয়নে আধূনিকের ভূমিকা অপরিসীম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আধূনিকের কর্মকাণ্ড প্রশংসিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান একাধিকবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সনদ লাভ করে।

ন্যাশনাল সোসাইটি অব হাইপারটেনশান-এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চিটাগাং ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। পাশে (ডানদিকে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি ও লেখক, (বামদিকে) অধ্যাপক সৈয়দ মোকাররম আলী, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ও অধ্যাপক ডা. শাহাদাত হোসেন (প্রয়াত)।

উচ্চ রক্তচাপ এক নীরব ঘাতক। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং তা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। বাংলাদেশে ঢাকাভিত্তিক উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থাকলেও চট্টগ্রামে এ ধরনের কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৯৭ সালে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে ইসলাম স্যারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। উনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। নিজেই ঠিক করেন সংগঠনের নাম হবে 'ন্যাশনাল সোসাইটি অব হাইপারটেনশন (এনএসএইচ)।' সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ইসলাম স্যার আমাকে বিস্তারিত নির্দেশনা দেন। চট্টগ্রামভিত্তিক এই সংগঠন হতে যাচ্ছে বলে উনার আগ্রহও ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এনএসএইচ এর আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন আয়োজিত হয় চট্টগ্রাম ক্লাবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি ছিলেন এনএসএইচ-এর সভাপতি, আমি সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) এম. আর খানসহ ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাংবাদিক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি নিরন্তর দেখেছেন তার বাস্তবায়নে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মবীর। স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে তিনি বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু হাল ছাড়েননি। সকল প্রতিকূলতা ঠেলে তিনি সামনে এগিয়ে গেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস সবসময় ছিল অটুট। অনেক বড় পাথেয় নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সেই পথ থেকে তিনি কোনভাবেই বিচ্যুত হননি। তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি সংকোচে হতবিহ্বল হননি, সংকটের আশংকায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েননি। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণীতে- 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান। সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ'। এই অভয়বাণীই তাকে সদা পরিচালিত করেছে।

উপস্থাপনা ও প্রকাশনা

জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তা তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন। তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানকে তিনি উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। কখনও তা করেছেন লিখিতভাবে- বৈজ্ঞানিক জার্নাল এবং বই প্রকাশনার মাধ্যমে; কখনও মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে। লিখিত প্রকাশনা কিংবা মৌখিক উপস্থাপনা- কোন্‌টাকে তিনি বেশি প্রাধান্য দেন? তা জানতে চাইলে তিনি আমাকে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম ইংলিশ লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'Reading make et a man, Writing an exact man, Speaking a ready man' (ভাবার্থ: পড়া মানুষকে তৈরি করে, লেখা মানুষকে যথার্থভাবে তৈরি করে আর বলা বা বক্তৃতা তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তোলে)।

ইসলাম স্যার ছিলেন একজন অসাধারণ উপস্থাপক। মৌখিক উপস্থাপনা কিংবা লিখিত প্রকাশনা- উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। প্রকাশনা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে উনার লেখা জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ 'জীবনস্রোতে'তে। তিনি লিখেছেন, 'প্রকাশনা সবসময় আমার একটা hobby। এতে আমি উৎসাহ পাই। আমার ধারণা কালের গতিতে এগুলো হয়ত বিলীন হবেনা। ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে এগুলোর গুরুত্ব থাকবে'। বৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রকাশনা, বই কিংবা সাময়িকী- যে কোন প্রকাশনায় উনার ছিল বিশেষ আগ্রহ। এসব সৃজনশীল কর্ম ছিল তাঁর জীবনের শখ। তাঁর চিন্তা, চেতনা, মননশীলতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এসব প্রকাশনায়। সারা জীবনের গবেষণার ফল তিনি লিখে গেছেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে- যা দেশে বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম স্যারের প্রকাশনা ছিল স্বকীয়তাপূর্ণ। নামকরণ, প্রচ্ছদসহ সমস্ত খুঁটিনাটি দিক তিনি নিজে দেখতেন। ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালীন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার উদ্যোক্তাও তিনি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার নামকরণ করেছিলেন 'চমক'। সত্যিই চমকপ্রদ ছিল চমেক এর প্রথম প্রকাশনা। উনার লেখা গ্রন্থ আটারটি। সব গ্রন্থের নামকরণ ও প্রচ্ছদ নিজেই

করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশনায় আমার সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়। বইয়ের পান্ডুলিপি লেখায় উনার ছিল বিশেষ ধরন। তিনি বলে যেতেন- অন্য কেউ লিখে যেতেন। এতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। এতে তাঁর চিন্তার প্রবাহ সাবলীল থাকতো। ইংরেজীতে পান্ডুলিপি লিখতে গিয়ে দেখতাম তাঁর ইংরেজী ভাষার দখল, শব্দচয়ন এক কথায় অসাধারণ। ডিক্টেশন দিতে গিয়ে কখনও দীর্ঘ সময় পার করে দিতেন। কোন কোন দিন বৈকালিক চেম্বার শেষ করে এ কাজে বসে যেতেন। আবার কখনওবা বিশেষ কোনদিন ও সময়ে তা করতেন। নিজে যেমন প্রকাশনায় আনন্দ পেতেন তেমনি সেগুলো পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তৃপ্ত হতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল এগুলো অন্যদের উদ্বুদ্ধ করুক; তারাও এধরনের সৃজনশীল কাজে এগিয়ে আসুক। ইসলাম স্যারের বিভিন্ন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমাকে প্রকাশনায় অনুপ্রাণিত করেছে। আমার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ হার্ট' সহ অন্যান্য প্রকাশনায় তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধ তাঁরই লেখা। অন্যসব বইয়ের মতো উনার লেখা বইগুলোরও একটা বিক্রয় মূল্য থকতো। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উনার একান্ত পছন্দের ব্যক্তিদের তিনি এগুলোর সৌজন্য কপি দিতেন। আমাকে দেওয়া সৌজন্য কপির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখে দিতেন স্নেহের প্রবীরকে শুভেচ্ছার সহিত'- নিচে তারিখসহ স্বাক্ষর। আমাকে যে স্নেহের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করেছিলেন তার বহি:প্রকাশ ঘটতো এভাবে।

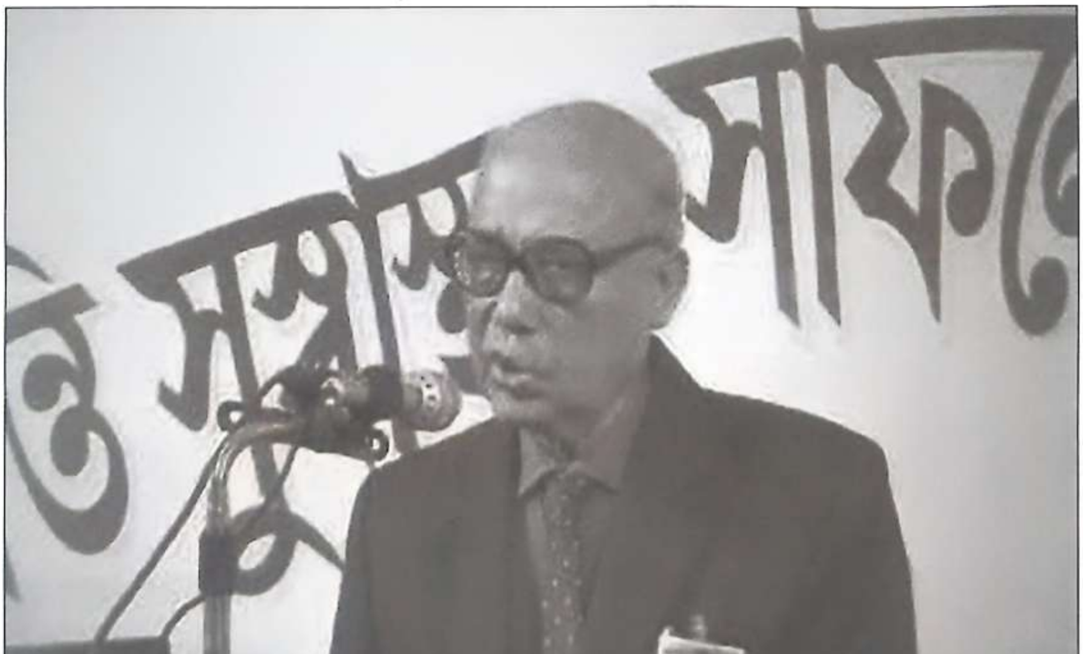

চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

ইসলাম স্যারের মৌখিক উপস্থাপনা ছিল হৃদয়গ্রাহী। যে কোন সভা, সমাবেশ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তাঁর উপস্থাপনা ছিল তথ্যবহুল ও মনোমুগ্ধকর।

বাংলা, ইংরেজি সব উপস্থাপনায় উপস্থিত থাকতো অসংখ্য দর্শক ও অংশগ্রহণকারী। উভয় ভাষাতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। যেকোন উপস্থাপনার আগে নিজেকে তৈরি করে নিতেন যথেষ্ট সময় নিয়ে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, তার সঠিক প্রয়োগ, শব্দ চয়ন, রেফারেন্স ব্যবহার- সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখতেন। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় তা উপস্থাপনার সময় কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ ছিল প্রাসঙ্গিক- যা এক কথায় অসাধারণ। দেশে বিদেশে কোন বিশেষ ধরনের উপস্থাপনা তৈরি করতেন অত্যন্ত যত্নসহকারে। কখনও সান্ধ্যকালীন চেম্বারের সময় কমিয়ে এনে তা তৈরি করতে নিবিষ্ট হতেন। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া কোন অনুষ্ঠানে যেতেন না এবং উপস্থাপনার সময় কখনও স্ক্রিপ্ট দেখতেন না। দর্শকের মনোযোগেরও যাতে সামান্যতম ঘাটতি না হয় সে ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকতেন। নির্ধারিত সময়েই উপস্থাপনা শেষ করতেন। সময়য়ানুবর্তিতা এখানেও সমভাবে কাজ করতো। উপস্থাপনায় থাকতো সূক্ষ্ণ রসবোধ আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শক ও অভ্যাগতগণ তা শুনতেন। ১৯৯৫ সালের ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে বঙ্গভবনে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে আধুনিক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উনি বক্তৃতা শেষ করলেন এভাবে- 'Let our hon'ble president have a long life and tobacco a very short life' (ভাবার্থ: মহামান্য রাষ্ট্রপতি দীর্ঘায়ু হোন এবং তামাক স্বল্পায়ু হোক)। অর্থাৎ আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজের বক্তৃতায় তাঁর এই মন্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইসলাম স্যারের রসবোধ

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ছিলেন প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী- রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির। তবে তাঁর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম রসবোধ। উনার নিকটজনরা তা সহজেই আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ দিক- যা প্রকাশ পেত দৈনন্দিন কাজে, রোগীর চিকিৎসায়, ছাত্রদের পাঠদানে আর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। রসবোধের সাথে উপস্থিত বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। একজন রসবোধ সম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক তার সরস বাক্যালাপে রোগীকে মানসিক চাপমুক্ত করে তোলেন। ওষুধের পাশাপাশি তা রোগীর মনস্তাত্বিক দিক উন্নত করে রোগ নিরাময়ে সহায়ক হয়। ইসলাম স্যার রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করতেন সার্থকভাবে। উনার চিকিৎসাপ্রার্থী অসংখ্য রোগী তাঁর সরস অথচ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেত। তাইতো স্বল্প ওষুধে রোগীকে সারিয়ে তোলা উনার পক্ষে এত সহজ হতো। একদিন বাহাদুর নামে চট্টগ্রামের জনৈক কমবয়সী রোগী সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম স্যারের সাক্ষাত লাভে সক্ষম হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রেসক্রিপশন লেখার সময় সে ইসলাম স্যারকে ব্যাকুলভাবে বার বার মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছে যে সে চট্টগ্রাম থেকে এসেছে। চট্টগ্রামের রোগীরা ডা. নুরুল ইসলামের চেম্বারে বিশেষ সমীহ আদায় করতে পারেন- এটা তারও জানা ছিল। ইসলাম স্যারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, 'অহ্, বাহাদুরত চাডিয়াতই আছে, আর কন জাগাত্ নাই' (হ্যাঁ, বাহাদুর তো চট্টগ্রামেই আছে, আর কোন জায়গায় নেই)! বাহাদুরের চেহারায় এক অভূতপূর্ব কৃতজ্ঞতাবোধ পরিলক্ষিত হলো। ইসলাম স্যারের এই মন্তব্যই তাকে অনেকটা সারিয়ে তুলবে মনে হলো।

মেদবাহুল্য নিয়ে অনেক রোগী উনার শরণাপন্ন হতেন। সাথে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শারীরিক অনেক সমস্যা- সবকিছুর মূলে মেদবাহুল্য। এদের অধিকাংশই উচ্চবিত্তসম্পন্ন। তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের নিবিড় পরিবর্তন সাধনের উপদেশ দিতেন। এদের কেউ কেউ দাবি করতেন যে তারা

খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন তবুও মেদবাহুল্য থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। এ ধরনের ধনাঢ্য পরিবারের মেদবহুল জনৈক রোগীনিকে ইসলাম স্যারের সরস জিজ্ঞাসা, 'আপনি রাস্তায় কোন ভিখারীকে দেখেছেন যার মেদবাহুল্য রয়েছে? আপনি যা খাচ্ছেন তা'ই আপনার জন্য বাহুল্য। খাওয়া কম হলে ওজনও কমতে বাধ্য। অনাহারক্লিষ্ট রাস্তার ভিখারী তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ'। এই মন্তব্য তার সমস্যা অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে নিশ্চয়ই।

কোন কোন রোগী বহুমূখী স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। তাদের অনেকেরই আঙ্গিক (organic) কোন রোগ নেই। যা আছে তা কেবল শরীরের কার্যগত (functional) কিছু সমস্যা। তারা একের পর এক বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে যান কিন্তু কারও চিকিৎসাই তেমন ফলদায়ক মনে করেন না। এদের কেউ কেউ এক পর্যায়ে ইসলাম স্যারের শরণাপন্ন হতেন। এ ধরনের ধনাঢ্য রোগীদের প্রতি উনার উপদেশ 'আজ আপনি গরীব হয়ে যান, কাল থেকে আপনার আর কোন অসুখ থাকবে না'। এটা শুধু ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা নয়, কার্যকরী উপদেশও বটে।

তিনি নিজে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতেন। রোগীদেরও তা মেনে চলতে উপদেশ দিতেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে। শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তার উপদেশগুলো পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। খাদ্যাভ্যাসের প্রভূত পরিবর্তন মেদবাহুল্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। প্রধান খাদ্য ভাতের উপর চাপ কমিয়ে প্রচুর শাক-সব্জি গ্রহণ করতে তিনি তাদের উৎসাহিত করতেন। এই উপদেশ ব্যক্তিবিশেষের মনঃপূত হয়নি- এমনটি মনে হলে তিনি বলতেন, 'কলা গাছ খেয়ে অতিকায় হাতি যদি টিকে থাকতে পারে শাক-সব্জি খেয়ে আপনিও টিকে থাকবেন।' এতে রোগী আশ্বস্ত হতেন এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন মেনে চলতে যত্নবান হতেন।

রোগী চিকিৎসা ছাড়াও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, ক্লাস, বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা ও প্রকাশনা- সব ক্ষেত্রে উনি সূক্ষ্ম রসবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। এতে ক্লাস, ওয়ার্ড ক্লিনিক্স ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা যেমন হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য হয়ে উঠতো তেমনি তা হতো কার্যকরী। ষাটের দশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) এর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার নাম 'চমক' দেওয়া কিংবা একুশ শতকে ওষুধের বিশুদ্ধতা ও নিরাপত্তা নিয়ে লেখা বইয়ের নামকরণ 'Purity Poisoned' (বিষাক্ত বিশুদ্ধতা) করা নিঃসন্দেহে তার সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় বহন করে। এছাড়া সভা সমাবেশে বক্তৃতায় উনার রসবোধের বহিঃপ্রকাশ ছিল মনে রাখার মতো। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ন্যাশনাল সোসাইটি অব হাইপারটেনশনের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নীরব ঘাতক উচ্চ রক্তচাপকে তিনি 'নীরব সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত

করেন। সমাজে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে এনে তার সাথে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বৃদ্ধি ও তার প্রাণঘাতি প্রভাবকে তুলনা করেন। তাঁর এই সরস উপস্থাপনা সবাইকে বিমুগ্ধ করে। ইসলাম স্যারের নিজ হাতে গড়া ধূমপান বিরোধী জাতীয় সংগঠনের নাম 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক)' রাখা, তাঁর উদাত্ত আহবান, 'আধূনিকে আসুন, আধূনিক হোন' কিংবা আধূনিকের বিভিন্ন স্লোগান- 'তামাক ও ধূমপান- এই দুই বিষপান,' বাবা-মার ধূমপান সন্তানের বিষপান' ইত্যাদি উন্নত রসবোধের সাক্ষর বহন করে।

ইসলাম স্যারের রসবোধের সর্বাঙ্গীন পরিচয় ফুটে উঠতো পি.জি. হাসপাতালের বার্ষিক বনভোজনে। প্রতিবছরই তিনি ঢাকার অদূরে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে এই বনভোজন আয়োজন করতেন। হাসপাতালের সকল চিকিৎসক, তাদের পরিবারবর্গ ও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এই বার্ষিক বনভোজন হয়ে উঠতো এক অপূর্ব মিলন মেলা। সারাদিন কাটতো আনন্দ উল্লাসে। ইসলাম স্যার ছিলেন এই আয়োজনের মধ্যমণি।

১৯৮৪ সালে গাজীপুরের শফিপুর জাম্বুরী মাঠে আয়োজিত পি.জি হাসপাতালের বার্ষিক বনভোজনের বেলুন ফোলানো প্রতিযোগিতার দৃশ্য। অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের বামপাশে নেফ্রোলজির অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান, পিজি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট কর্ণেল ডা. এম এ সামাদ এবং এনেস্থেসিয়ার অধ্যাপিকা ডা. আফজালুন্নেসা। এছাড়া তদানীন্তন আইপিজিএমআর-এর এমবিবিএস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাঁর কনিষ্ট কন্যা ডা. নীনা ইসলামকে দেখা যাচ্ছে।

তাঁর রসোদ্দীপক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সারাক্ষণ সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। সঙ্গী হিসেবে থাকতেন তাঁর বাল্যবন্ধু চর্মরোগের অধ্যাপক (ডা.) আবদুল অদুদ। দুজন যেন ফিরে পেতেন তাদের ফেলে আসা বাল্যকাল। অন্যরা তা দেখে উল্লসিত হতেন। অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক, ছাত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মঞ্চাভিনয়ে আমন্ত্রণ জানাতেন। কাউকে হয়তো বলতেন, 'আপনি রাস্তায় ওষুধের ক্যানভাসারের অভিনয় করে দেখান,' আবার কাউকে হয়তো বলতেন, 'আপনি কৃপনের অভিনয় করে দেখান' (চেহারা আর আচরণে হয়তো কৃপণভাব প্রকট তাই) ইত্যাদি। কখনওবা কোন দম্পতিকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং বিভিন্ন রসালো উক্তি দিয়ে হাসির বন্যা বয়ে দিতেন। নিজে অবশ্য কেবল মুচ্‌কি হাসি হাসতেন। হাস্যকৌতুক ছাড়াও সেখানে থাকতো আনন্দদায়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন- হাটে হাঁড়িভাঙ্গা, মিউজিক্যাল চেয়ার, ফুটবল খেলা, বেলুন ফোলানো ইত্যাদি।

ইসলাম স্যারের এই রসবোধ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হতো। ১৯৯৪ সালে এক শুক্রবার সকালে ইসলাম স্যারের সাথে আমি বাংলাদেশ বিমানে যশোহর হয়ে ঝিনাইদহ যাবো। সাথে স্যারের ছেলে আহমদ ইফতেখার ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোমেডিসিনের অধ্যাপক (ডা.) আবদুল হান্নান। আমরা বিমান বন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে অপেক্ষমান। বিমান ছাড়তে তখনও বেশ খানিকটা সময় বাকি। এই অবসরে ইসলাম স্যার ল্যান্ডফোনে কল করলেন উনার বাল্যবন্ধু অধ্যাপক (ডা.) অদুদ সাহেবের বাসায়। মোবাইল ফোন তখনও আসেনি। তিনি নিজ পরিচয় গোপন রেখে ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অদুদ আছে'? টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে ইসলাম স্যার ধমকের সুরে বললেন, 'আমি তার বাবা!' অদুদ সাহেব টেলিফোন থেকে দূরে ছিলেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে টেলিফোন ধরেন। বিভিন্ন আলাপচারিতা, হাস্য-রসিকতা ইত্যাদি চললো কিছুক্ষণ। বলাবাহুল্য, উনি অদুদ সাহেবের শ্বশুরবাবা।

ছুটির দিনে

সারা সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার পর সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে ইসলাম স্যারকে দেখা যেত কিছুটা আয়েশী ভঙ্গীতে। দৈনন্দিন কাজের চাপ নেই, নেই বৈকালিক চেম্বার। দুপুরে জুমার নামাজ। সবমিলিয়ে শুক্রবারটা উনি কাটাতেন ভিন্নভাবে। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদি রাখতেন এই দিনে। প্রকাশনা ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজের জন্য তিনি এই দিনকে বেছে নিতেন। কোনো কোনো শুক্রবারে আমি ইসলাম স্যারের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতাম। দেখতাম তিনি আছেন রিলাক্স মুডে। আমাকে চা পানে আপ্যায়ন করতেন। আলাপচারিতা চলতো- চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সব বিষয়ে। এভাবে একসময়ে জুমার নামাজের সময় এসে পড়তো। বাসার কেয়ারটেকার এসে তা মনে করিয়ে দিত। শুভানুধ্যায়ী কেউ তাগাদা দিয়ে বলতেন, 'নামাজের আগের খুত্‌বা শুনলে সওয়াব'। কিন্তু ইসলাম স্যার পৌঁছাতেন নামাজের ঠিক আগ মুহূর্তে। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি 'শুধু শোনা-ই নয়, তা পালনের মধ্যেই সত্যিকার সওয়াব নিহিত'। এক শুক্রবারে উনার গাড়ীর ড্রাইভার অনুপস্থিত। ইসলাম স্যার বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিক্সা নিলেন। আমাকে উনার পাশে বসালেন। রওনা হলেন বাসার নিকটস্থ সাইন্স ল্যাবরেটরীর বায়তুল মামুর মসজিদ অভিমুখে। রিক্সায় বসে চালকের কাছে জানতে চাইলেন তার ধূমপানের অভ্যাস আছে কিনা। রিক্সাওয়ালাকে উপদেশ দিলেন ধূমপান বর্জন করতে। রিক্সায় আসীন সময়টুকুকেও তিনি পরহিতকর কাজে লাগাতে তৎপর। ততক্ষণে রিক্সা সাইন্স ল্যাবরেটরী পৌঁছে গেল। আমি যাব শাহবাগস্থ পি.জি হোস্টেলে। উনি ভাড়া মিটিয়ে রিক্সাওয়ালাকে আমাকে পৌঁছে দিতে বলে রিক্সা থেকে নেমে মসজিদে ঢুকলেন।

১৯৯৪ সালে এক ছুটির দিনে আমি ইসলাম স্যারের সাথে ঝিনাইদহে বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব নুরে আলম সিদ্দিকীর বাড়ী গেলাম। সাথে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজী বিভাগের অধ্যাপক (ডা.) আবদুল হান্নান এবং ইসলাম স্যারের ছেলে জনাব আহমদ ইফতেখার ইসলাম (জনসেবা ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান)।

ঝিনাইদহে অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের পাশে (ডানদিকে) জনাব নুরে আলম ছিদ্দিকী, অধ্যাপক ডা. আবদুল হান্নান এবং (বামদিকে) আহমদ ইফতেখার ইসলাম ও লেখক ।

ঝিনাইদহে ছিদ্দিকী সাহেবের মায়ের নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সেখানে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যই এই আয়োজন। উনি ইসলাম স্যারকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন। বাড়ীতে ইসলাম স্যার এসেছেন তাই আপ্যায়নের বিশেষ ব্যবস্থা। খাবার টেবিলে হরেক রকমের খাবার। ছিদ্দিকী সাহেবের অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও ইসলাম স্যার চর্বিসমৃদ্ধ সব ধরনের খাবার সযত্নে পরিহার করে চললেন। ইতিপূর্বে উনার বাইপাস সার্জারী করা হয়েছে হৃৎপিণ্ডের ব্লক সারাতে। ছিদ্দিকী সাহেবের আপ্যায়নে যাতে তাঁর বাইপাস পরবর্তী গৃহীত খাদ্য নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যত্যয় না ঘটে সে সচেতনতা তাঁকে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠতে তাড়া করছে। এদিকে সিদ্দিকী সাহেব আমাকে খেতে উৎসাহিত করছেন বিভিন্নভাবে। মনে করিয়ে দিলেন সত্তরের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন উনার ভোজন বিলাসিতার কথা। তিনি সেই সময়কার তুখোড় ছাত্র নেতা এবং তদানীন্তন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি। খাবারের আয়োজনের পাশাপাশি ছিদ্দিকী

সাহেবের উৎসাহব্যঞ্জক আপ্যায়নে আমি খাবার টেবিলে একটু বেশী সময় আটকে রইলাম। এদিকে টেবিল মেনার্স এর কারণে ইসলাম স্যার উঠতে পারছেন না। ছিদ্দিকী সাহেবের আপ্যায়নের আতিশয্য থেকে বাঁচতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইসলাম স্যার চাইছেন আমি তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে উঠে পড়ি। এতে তিনিও রেহাই পান। তাই উনি আমাকে বললেন 'প্রবীর, আপনি খাবার-দাবার বেশ পছন্দ করেন দেখছি'! আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অগত্যা খাবার শেষ করে একসাথে উঠে পড়লাম। ঝিনাইদহ থেকে ঢাকা ফেরার আগে ইসলাম স্যারের ইচ্ছা ছিল তিনি নিকটবর্তী কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী পরিদর্শনে যাবেন। সেই মোতাবেক আমরা রওনা হলাম। পথিমধ্যে জানা গেল ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ার সংযোগস্থলের সেতু অকেজো। পারাপার সাময়িক বন্ধ। তাই আমরা আর অগ্রসর হলাম না। গাড়ী ঘুরিয়ে আমরা পৌঁছলাম ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জের মল্লিকপুরে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন বটবৃক্ষ দর্শনে। গ্রামীণ জনপদের আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম একটি অতিকায় বটবৃক্ষ। বড় এক মাঠের প্রায় পুরো এলাকা জুড়ে তার অবস্থান। ধারণা করা হয় এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ বটগাছ। সে বটবৃক্ষ দর্শনে শিলাইদহ যেতে না পারার বেদনা কিছুটা লাঘব হলো। ইসলাম স্যারের সরস মন্তব্য 'বিশ্বকবির শিলাইদহ কুঠিবাড়ী দেখতে না পারি বিশ্ব বটগাছ তো দেখলাম'। তারপর আমরা যশোর হয়ে বিমানে ঢাকা ফিরলাম।

২০০০ সালের ঈদুল আযহা পরবর্তী কোন এক শুক্রবার। আমি তখন কার্ডিওলজীর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে বগুড়া মেডিকেল কলেজে কর্মরত। ঢাকা হয়ে বগুড়া যাবার পথে আমি ইসলাম স্যারের সাথে দেখা করতে উনার ধানমন্ডির বাসায় যাই। বগুড়াগামী কোচ ছাড়বে দুপুরের পর কল্যাণপুর থেকে। উনি আমাকে বাসায় বসিয়ে জুমার নামাজ পড়ে আসলেন। আসার পথে ধানমন্ডির এক রেষ্টুরেন্ট থেকে আমার জন্য এক প্যাকেট চিকেন বিরিয়ানী নিয়ে আসলেন। বাসায় আলাদা টেবিলে আমার খাবারের ব্যবস্থা করলেন। নিজে বিরিয়ানীর প্যাকেট খুলে প্লেটে সাজিয়ে দেন। উনার বাসায় চন্দনাইশের গ্রামের বাড়ী থেকে পাঠানো কোরবানীর গোশ্ত রান্না করা আছে। আমি তা খাব না বলে ইসলাম স্যারের এই উদ্যোগ। তাঁর এই স্নেহবাৎসল্য আমাকে বিমোহিত করে। খাবার শেষে ড্রাইভারকে দিয়ে উনি আমাকে কল্যাণপুরে বগুড়ার গাড়ীতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন।

ইসলাম স্যারের সাথে আমি একধরনের আত্মিক বন্ধন অনুভব করতাম। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াও ছুটির দিনে কখনও কখনও উনাকে দেখতে যেতাম। উনার সান্নিধ্য যেমন আমাকে অনুপ্রাণিত করতো তেমনি আমার উপস্থিতিতে তিনি প্রফুল্ল বোধ করতেন। তিনি খুব মিতাহারী ছিলেন। স্বাস্থ্যগত কারণে খাবার-দাবারে নিয়ন্ত্রণ মেনে চললেও বিশেষ কিছু খাবারের প্রতি উনার দুর্বলতা ছিলো বৈকি।

কখনোবা উনার পছন্দের সামান্য কিছু নিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। প্রসঙ্গত ইসলাম স্যারকে খুশী করতে, তাঁর সানুগ্রহ লাভে অনেকে উপঢৌকন নিয়ে যেতেন। উনার কড়া নির্দেশ ছিল অনুমতি ছাড়া এসব যাতে গৃহীত না হয়। তবে ঘনিষ্ঠজন ও আত্মীয় স্বজনের বেলায় নিশ্চয়ই এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। অন্য যে ক'জনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম শিথিল করা হতো আমিও তার মধ্যে ছিলাম।

ইসলাম স্যার নিজে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতেন। তেমনি অন্যদেরকেও আপ্যায়ন করাতেন স্বাস্থ্যসম্মত খাবারে। এক ছুটির দিনে আমি উনার সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতায় কাটানোর এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন 'প্রবীর, আজ আপনার জন্য একটা নতুন জিনিস আছে। তবে তার আগে দেখি ইফতেখার (স্যারের ছেলে) তা কী অবস্থায় রেখেছে। এটা তার খুব পছন্দের'। স্যার উঠে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন। পিছন পিছন গৃহকর্মী গ্লাসভর্তি জুস্ নিয়ে হাজির। তা ছিল অস্ট্রেলিয়ান অ্যাপেল জুস্। উনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তা সেদিন আরো একবার অনুধাবন করেছি।

চট্টলপ্রেমিক, একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক

'মানুষ যেইটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে সেইটুকুকে কতই ভালোবাসে। তাহার প্রেমের প্রভাবে, সেই ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মতো মূর্তি ধারন করে'- রবি ঠাকুরের এই বাণীর প্রতিফলন জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামের চন্দনাইশের মোহাম্মদপুর গ্রামে। এখানেই কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর। গ্রামের মমতা মাখানো অকৃত্রিম পরিবেশে বেড়ে উঠা এই ভূখণ্ডের প্রতি তার ভালোবাসা অটুট ছিল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তিনি ভালোবেসেছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষকে। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। মায়ের মতোই তিনি ভালোবাসেন চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশকে। জন্মস্থান চট্টগ্রামের প্রতি সৃষ্ট তাঁর মমত্ববোধ বিস্তৃত হয় সমগ্র দেশের প্রতি।

জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলামের চট্টলপ্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। পিজি হাসপাতালের পরিচালক থাকাকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্মচারী ও চিকিৎসকরা বিভিন্নভাবে তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছেন। তিনি তাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতেন। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে তিনি তৃপ্ত হতেন। চট্টগ্রাম বাড়ি হবার সুবাদে অন্যান্যদের মতো আমিও ব্যক্তিগতভাবে পিজি হাসপাতালে অধ্যয়নরত অবস্থায় বিভিন্ন মহলের সুনজরে থাকতে সক্ষম হয়েছি। বাড়ি চট্টগ্রাম-এ পরিচয়ে তাঁর সহানুভূতি আদায় খুব সহজ ব্যাপার ছিল। উনার বৈকালিক চেম্বারেও চট্টগ্রাম থেকে আগত রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল- যাতে স্বল্প সময়ে তারা উনার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন। কারো বাড়ী চট্টগ্রাম হলেই তিনি বাক্যালাপ শুরু করতেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়। কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী সাধু ভাষায় কথা বলতে চাইলে

তাকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলতে উৎসাহিত করতেন। ঢাকা এবং কলিকাতাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাথে তাঁর ছিলো আত্মিক সম্পর্ক। চট্টগ্রাম অঞ্চলের যে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেই তিনি ছুটে আসতেন নাড়ির টানে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ.এস.টি.সি) তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন চট্টগ্রামেই। 'আমি চাইলে এই বিশ্ববিদালয় ঢাকাতে করতে পারতাম। তা আমার জন্য আরো সহজ হতো। আমার বাড়ী চট্টগ্রাম। তাই এটাকে ইউনিভার্সিটি অব্ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী, চিটাগাং (ইউ.এস.টি.সি) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলাম। এই প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে চট্টগ্রামকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দিলাম। যেমন আই.সি.ডি.ডি.আর.বি-এর নামের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত। ভবিষ্যতে আমার অনুপস্থিতিতে যাতে কেউ এই নাম পরিবর্তন করতে না পারে'। ইউ.এস.টি.সি প্রতিষ্ঠা ও তার নামকরণের পরিপ্রেক্ষিত তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন এভাবেই। এটা চট্টগ্রামের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের অপূর্ব নিদর্শন।

চট্টগ্রামের উন্নতি যেমন তাঁকে তাড়িত করতো তেমনি এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন তাঁকে উৎফুল্ল করতো। যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখেছেন, যার বাস্তবায়নে তিনি সদা সচেষ্ট থেকেছেন- তার মূল চালিকা শক্তি ছিলো গভীর দেশপ্রেম। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি স্বল্পসময়ে এমআরসিপি পাশ করে বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসে এ দেশের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কেবল স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই এদেশ উন্নতি লাভ করুক-এটাই ছিল তার প্রত্যাশা। এই আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে প্রধান অতিথির ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বাস আর সাহস এ দুটো নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিকুল পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রকৃতির সনাতন ধর্ম। বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া থেকে সাহারা মরুভূমিতে সৃষ্ট জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে খাপখাইয়ে জীবনযাপন করে। পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক না কেন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকার মতো বাঁচতে হবে- সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে। পরনির্ভরশীল পরজীবী হিসেবে নয়, স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে। জীবন থাকতে আমরা যেন মরে না যাই। আজকের শপথ এগিয়ে চলার, আত্মশুদ্ধির, অনুশোচনার এবং পরিশোধনের, পরিতৃপ্তির নয়'।

তিনি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ নিযুক্তির সময় বঙ্গবন্ধু উনাকে বলেছিলেন, 'আপনাকে আমার চিকিৎসক হিসেবে পেতে চাই। পয়সা দিতে পারব না, আমরা গরীব। আপনি কি রাজী ডাক্তার সাহেব?' উনি জবাবে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে সম্মানীর জন্য অনুরোধ জানাতাম।

এখন দিলেও নেব না। টাকাটা আমার দেশে অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশেই থাকবে, পাকিস্তানে যাবে না'। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আপনার যুক্তি চমৎকার। মেনে নিলাম ডাক্তার সাহেব'। বঙ্গবন্ধুর মতো মহান দেশ প্রেমিকের সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশপ্রেম পূর্ণতা লাভ করে। প্রসঙ্গত: ভারতের প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন ডা. দেবী শেঠী ছিলেন কলকাতায় মাদার তেরেসার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। মাদারের সংস্পর্শে

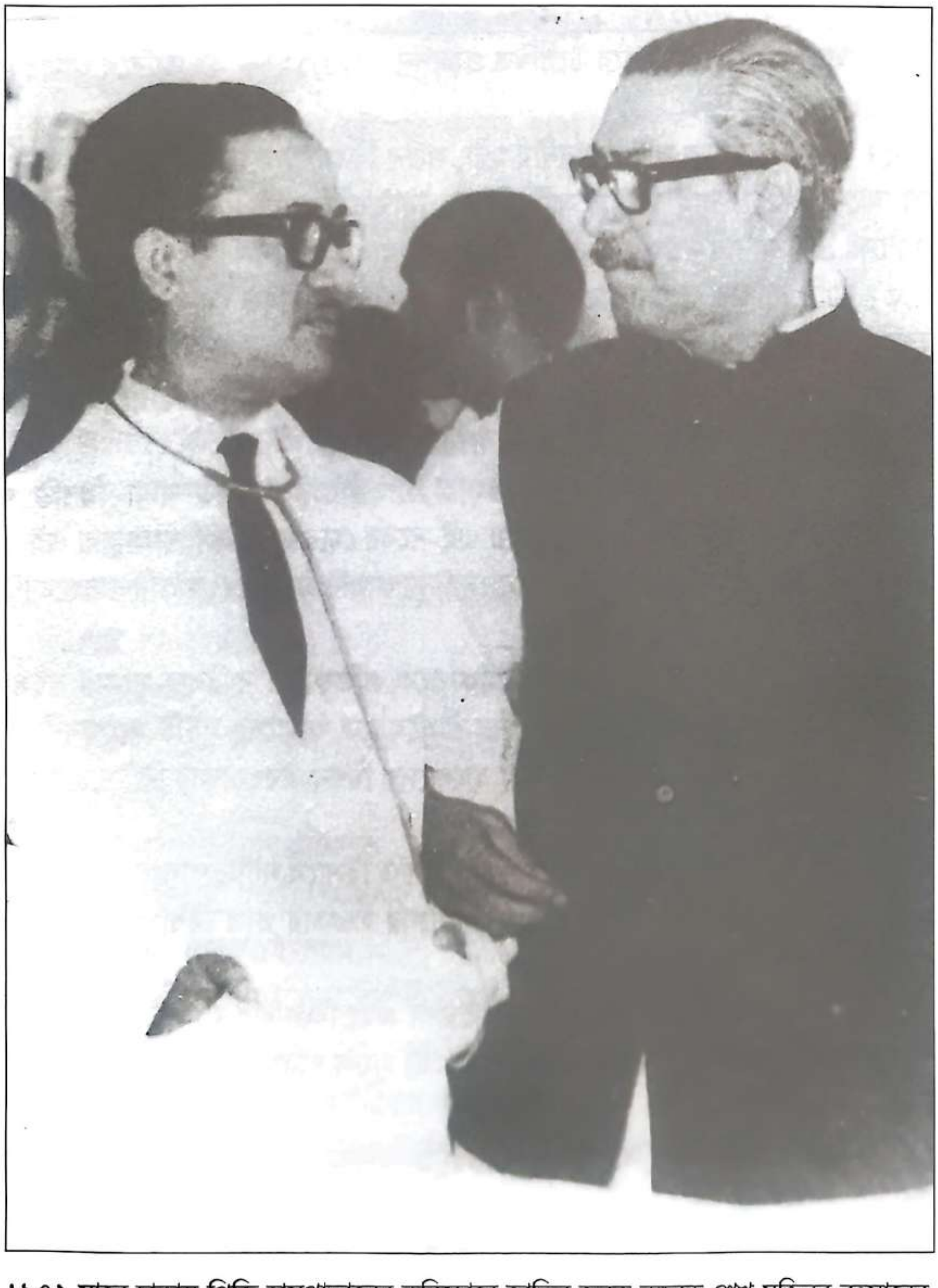

১৯৭২ সালে ঢাকাস্থ পিজি হাসপাতালের করিডোরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

এসে ডা. শেঠী মানবসেবার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হন। আর্তমানবতার সেবার যে দৃষ্টান্ত উনি স্থাপন করেছেন তা আজ বিশ্বনন্দিত। একইভাবে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হবার সুবাদে ইসলাম স্যারের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম বিকশিত হয়। ডা. দেবী এবং ডা. নুরুল ইসলাম- দু'জন দুই প্রতিবেশী দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুই দিকপাল। উনারা পরস্পর ছিলেন সুহৃদ।

গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম স্বাস্থ্য সেবাসহ এদেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার পুরোধা প্রতিষ্ঠান তৎকালীন আইপিজিএমআর প্রতিষ্ঠা, জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন, অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা তার মহান দেশপ্রেমের পরিচায়ক। তার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৭ সালে তিনি ভূষিত হন জাতীয় অধ্যাপকের সম্মানে। সকল ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন এদেশের জাতীয় সম্পদ। তাঁর সারাজীবনের মঙ্গল কামনা করে মহিয়সী কবি বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন- 'সংসার, সমাজ, দেশ, জাতির গৌরব/ বিশ্বময় ব্যাপ্ত তাঁর খ্যাতির সৌরভ/ জাতির সম্পদ তাঁর অমূল্য জীবন/ সাফল্যমণ্ডিত যেন থাকে অনুক্ষণ'।

শেষ দেখা

বিশ্বখ্যাত ইংলিশ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ার বলেছেন- 'পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ, সমস্ত পুরুষ এবং নারী তার অভিনেতা আর অভিনেত্রী'। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয় কিন্তু মানুষের জীবনের কোন দৃশ্য কিংবা ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটে না। সে অর্থে মানুষের জীবনের প্রতিটি দৃশ্যই শেষ দৃশ্য আর প্রতিটি দেখাই শেষ দেখার সমতুল্য। চলার পথে আমরা অনেক সময়ই এই সত্যটা বিস্মৃত হই। 'আবার দেখা হবে'- এই আশায় থাকাটা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; প্রাণের এক আকুতি।

ইসলাম স্যারের সাথে আমার দেখা হয়েছে অগুনতিবার -বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে। ক্লাসে, হাসপাতালে, রোগী চিকিৎসায়, সাংগঠনিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উনার সাহচর্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। উনার সাথে আমার শেষ দেখা ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ শুক্রবার দিন। সেদিন ছিল ঢাকার মহাখালীস্থ বাংলাদেশ কলেজ অব্ ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস) এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও কাউন্সিলর নির্বাচন। প্রতি দুই বছর অন্তর নতুন আটজন কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য এফসিপিএস ডিগ্রিধারী ফেলোগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বিসিপিএস- এ সমবেত হন। বিসিপিএস বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এফসিপিএস-এর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। ইসলাম স্যার বিসিপিএস-এর সম্মানিত ফেলো এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর বার্ষিক সভা ও নির্বাচনে যোগ দিতে এসেছেন। স্ট্রোক পরবর্তী শারীরিক অক্ষমতার কারণে একা হাঁটতে অসুবিধা হয় বৈকি। তবু এসেছেন নাড়ির টানে। বিসিপিএস ক্যাম্পাসে গাড়ী থেকে নামতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম গাড়ীর কাছে। আমাকে দেখে গাড়ী থেকে নামতে উনি হাত বাড়িয়ে দেন। হাত ধরে গাড়ী থেকে স্যারকে নামিয়ে জানতে চাইলাম উনি প্রথম

কোথায় যাবেন। ইসলাম স্যার প্রথম গেলেন কনফারেন্স রুমে। সেখানে বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম চলছে। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ফেলোগণ স্ব-স্ব আসনে আসীন- মঞ্চে সভাপতি, সেক্রেটারী এবং ট্রেজারার। সেক্রেটারীর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনা চলছে। সভাস্থলে ইসলাম স্যারকে উপস্থিত হতে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে উনাকে সম্ভাষণ জানান। উনি সামনের সারিতে আসণ গ্রহণ করেন। আমি বসলাম কিছুটা পিছনে। ঘন্টা খানেক সভাস্থলে কাটানোর পর উনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি এগিয়ে উনার হাত ধরে কনফারেন্স হল থেকে বের হলাম। তারপর উনি বিসিপিএস-এর সভাপতির রুমে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ইসলাম স্যারের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছাত্র অধ্যাপক (ডা.) মাহমুদ হাসান (বর্তমান বিএমএ সভাপতি) বিসিপিএস-এর তৎকালীন সভাপতি। ইসলাম স্যার রুমে প্রবেশ করলে অধ্যাপক মাহমুদ হাসান উনাকে স্বাগত জানিয়ে সোফাতে বসতে অনুরোধ করেন। রুমে অন্যান্যদের সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে মেডিসিনের অধ্যাপক (ডা.) তোফায়েল আহমদ এবং সার্জারীর অধ্যাপক (ডা.) সানোয়ার হোসেন অন্যতম। সবাই ইসলাম স্যারের প্রাক্তন ছাত্র। অনেক দিন পর ইসলাম স্যারকে কাছে পেয়ে উনারা খোশগল্পে মেতে উঠেন। আলোচনায় উঠে আসে ইসলাম স্যার পিজি হাসপাতালের পরিচালক থাকাকালীন সময়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। আসল ইউএসটিসি প্রসঙ্গও। এখানে চা পান শেষে ইসলাম স্যার এবার ভোট কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হলেন। বিসিপিএস-এর করিডোর দিয়ে উনি হেঁটে যাচ্ছেন। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনেকে এ সময় তাঁকে পায়ে ধরে সালাম করলেন। এক সময়কার সহকর্মী, যারা অনেকে আজ বয়সের ভারে ন্যুব্জ, তারা করমর্দন করলেন, কুশলাদি জানলেন। আমি উনাকে লিফটে তুলে ভোট কেন্দ্রের দিকে নিয়ে গেলাম। ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ভোট দিয়ে আসেন। ভোট দান শেষে আমি আবার উনাকে নিয়ে লিফটে নীচে নেমে এলাম। ইসলাম স্যার বললেন, 'জুম্মার নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবার যাওয়া যাক'। আমি উনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে পদধূলি নিলাম। বিদায় বেলায় স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উনি বললেন, 'প্রবীর, আবার দেখা হবে'। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। তখন আমাদের দু'জনের কারোই হয়ত মনে হয়নি যে এই দেখাই শেষ দেখা।

যখন রোগশয্যায়

রোগী হিসাবে ডাক্তারদের একটা বদনাম আছে-'Doctors are bad patient'! অর্থাৎ ডাক্তারেরা রোগী হিসাবে ভালো না। কে, কবে রোগীরূপী ডাক্তারদের সম্পর্কে এই বাণী দিয়ে গেছেন তা জানা নেই, তবে তা সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়- একথা বলা যায়। জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ডাক্তার হিসেবে যেমন ভালো ছিলেন তেমনি রোগী হিসেবেও ভালো ছিলেন। তিনি কেবল জনসাধারণের মাঝেই সুস্বাস্থ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেননি, নিজেও তা অনুশীলন করেছেন। এক সময়ে তিনি ধূমপায়ী ছিলেন। সে অভ্যাস বিসর্জন দেন। শারীরিকভাবে ছিলেন বরাবরই সুস্থ। এক সময় ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। তা সবসময় রাখতেন সুনিয়ন্ত্রিত। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ-জরা তাঁকে আক্রান্ত করেছে। কিন্তু তিনি এসবের সময়োপযোগী ও যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর চিকিৎসকদের প্রদত্ত চিকিৎসা ও নির্দেশনা মেনে চলতেন পুংখানুপুংখভাবে। এক্ষেত্রে তাঁর চিকিৎসক সত্তার সাথে শারীরিক অসুখের কারণে সৃষ্ট রোগী সত্তার কোন দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়নি। আর সেই কারণেই কোন ধরনের শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে কাহিল করে তুলতে পারেনি। রোগের কারণে তিনি কখনো দীর্ঘ সময়ে শয্যাশায়ী হননি। চেম্বারে রোগী দেখার সময় কিংবা অফিসে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত সময় কাটাতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতেন তাঁর বাম হাতে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। উনার সন্দেহ তা হার্টের অসুখের কারণে হতে পারে। যদিও তিনি কখনও কোন বুকব্যথা অনুভব করেননি। একদিন

এই সন্দেহের কথা তিনি আমাকে বললেন। আমি বললাম 'স্যার, হার্টের ব্যথা বুকে না হয়ে কেবলমাত্র হাতেও তো হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা আবশ্যক।' এই আলাপচারিতা যখন চলছিল তখন আমি হৃদরোগ বিষয়ে এমডি কোর্সে অধ্যয়নরত। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এই ব্যাপারটা আমার সাথে আলাপ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পেরিয়েছে। উনার শারীরিক সমস্যার তীব্রতাও বেড়েছে। হার্টের অসুখের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি এনজিওগ্রাম করালেন। এতে হার্টের রক্তনালীতে ব্লক ধরা পড়লে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাইপাস অপারেশন করান। ব্লক বেড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত হার্ট অ্যাটাক হয়ে পড়ার আগেই তিনি বাইপাস অপারেশন করিয়ে নেন। এতে হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ যেমন সম্ভব হয় তেমনি হার্টের কর্মক্ষমতা সুরক্ষিত রাখাও সম্ভব হয়। হার্টের রক্তনালীর মতো মস্তিষ্কের রক্তনালীতেও একপর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে অসুস্থ বোধ করাতে উনি ঢাকাস্থ সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি হন। আমি তখন সদ্য এফসিপিএস পাশ করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ শুরু করেছি। সিলেটে অবস্থান কালেই আমি ইসলাম স্যারের অসুখের খবর শুনি। সিলেট থেকে ঢাকা রওনা হবার আগে হযরত শাহ্ জালালের মাজারে গিয়ে স্যারের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করে তবরুক নিয়ে আসি। ঢাকা পৌঁছে সিএমএইচ এর কেবিনে ইসলাম স্যারকে দেখতে যাই। সেদিনই প্রথম উনাকে আমি রোগ শয্যায় দেখি। পেশাগত জীবনে অগনিত রোগীর রোগ শয্যায় তিনি চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যেমন ছিল অতি সাধারণ ব্যক্তি তেমনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লীকবি জসীম উদ্দিন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রোগশয্যার পাশে তিনি ছিলেন তাঁদের চিকিৎসক হিসাবে। আজ তিনি নিজেই রোগশয্যায়। আমি উনার কুশলাদি জানলাম এবং অনেকটা সময় ইসলাম স্যারের সাথে কাটালাম। উনি পরম শ্রদ্ধাভরে মাজারের তবরুক গ্রহণ করেন। কয়েক দিনের মধ্যে উনি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেন।

১৯৯৯ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রাম অবস্থানকালে একবার তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মস্তিষ্কের রক্তনালীতে প্রতিবন্ধকতাজনিত রক্ত প্রবাহে ঘাটতির কারণে এই অবস্থা। তাঁকে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজী বিভাগের সিসিইউ-তে ভর্তি করা হলো। আমি তখন কার্ডিওলজী সহকারী অধ্যাপক হিসাবে বগুড়া মেডিকেল কলেজে কর্মরত এবং ছুটিতে চট্টগ্রাম অবস্থান করছি। ইসলাম স্যারকে দেখতে ছুটে গেলাম সেখানে। এই হাসপাতালে তৎকালীন কর্মরত সিনিয়র চিকিৎসকদের প্রায় সবাই উনার ছাত্র। তাঁরা উদ্বিগ্নবোধ

করলেন। অবস্থা সংকটাপন্ন মনে হলো। উনি চোখ মুদে আছেন। অনেকক্ষণ কোন সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমি এক সময় লক্ষ্য করলাম উনি বামহাত নাড়ানোর চেষ্টা করছেন। মনে মনে আশ্বস্থ হলাম- উনি সম্ভবত জ্ঞান ফিরে পাচ্ছেন; শংকা কেটে যাচ্ছে। ইসলাম স্যারের এক সময়কার ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পরবর্তীকালে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক (ডা.) আবু সাঈদ স্বগোতোক্তি করলেন, 'ইনশাল্লাহ, স্যার সেরে উঠবেন, অগনিত রোগীর দোয়া আছে উনার জন্য।' ইসলাম স্যারকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে জরুরীভাবে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হলো। পরবর্তীকালে পরীক্ষানিরীক্ষায় মস্তিষ্কের রক্তনালীর ব্লক নিশ্চিত হয়। অ্যামেরিকার বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাঃ এস. সাহা ঢাকা সিএমএইচ- এ উনার অপারেশন করে ব্লক সারালে উনি সুস্থ ও সচল হয়ে উঠেন।

হার্টের বাইপাস আর মস্তিষ্কের রক্তনালীর অপারেশন- এই দুটো অত্যাধুনিক চিকিৎসা সঠিক সময়ে গ্রহণ করাতে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ ও কর্মক্ষম থেকেছেন দীর্ঘদিন। অন্তিম সময়েও উনাকে রোগশয্যায় বেশি সময় কাটাতে হয়নি। ২০১৩ সালের ১৭ জানুয়ারী চেম্বারে রোগী দেখার সময় হঠাৎ অসুস্থবোধ করলে উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাত্র কয়েক ঘন্টা ছিলেন রোগশয্যায়। হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যু সম্পর্কে স্যামুয়েল পোপ্‌স লিখে গেছেন- 'মৃত্যুকে স্বাগত জানানো যায় কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থাই আমাকে আতঙ্কিত করে।' কেবল স্যামুয়েল নন, অন্তিম সময়ে সম্ভাব্য মুমূর্ষু অবস্থার কথা চিন্তা করে সবাই আতঙ্কিত হয়। ইসলাম স্যারকেও হয়ত এই ভাবনা আতঙ্কিত করতো। কিন্তু তাঁর রোগশয্যাকালীন সময় প্রলম্বিত হয়নি। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে থাকতে হয়নি। সজ্ঞানেই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন।

অন্তিম শয়ানে

জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম ২০১৩ সালের ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার চেম্বারে রোগী দেখার সময় আকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। জীবনরক্ষাকারী সব চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চিরবিদায় নেন।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (তদানীন্তন পি.জি. হাসপাতাল) দুই দফা জানাযা শেষে মরদেহ আনা হয় জন্মস্থান চট্টগ্রামে। নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের বাড়ী চন্দনাইশ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে। এখানেই শায়িত আছেন তাঁর মা-বাবা, এখানেই কেটেছে উনার শৈশব কৈশোর। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরাকান সড়ক থেকে পশ্চিমে পিচ্‌ঢালা প্রশস্ত রাস্তার পাশেই ইসলাম স্যারের পৈতৃক বাড়ি। এই রাস্তার নামও জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম সড়ক। জীবদ্দশায় অসংখ্যবার তিনি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেছেন। তবে এই যাত্রায় চলার কোন তুলনা নেই। এটা চিরন্তনী যাত্রা। অগনিত গ্রামবাসী, আত্মীয় স্বজন আসলেন তাদের প্রিয়জনকে শেষ দেখা দেখতে। এখান থেকে মরদেহ আনা হলো চট্টগ্রাম নগরীর জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় ঈদগাঁহ ময়দানে। এখানে সর্বস্তরের মানুষ জানাযায় যোগ দিলেন। আমি দুপুর দু'টার দিকে হাসপাতালের দায়িত্ব শেষে সেখানে পৌঁছে দেখি জানাযা শেষে কফিন ইউএসটিসিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইউসিটিসির কার্ডিওলজীর অধ্যাপক (ডা.) সৈয়দ মোস্তফা কামালের সাথে টেলিফোনে তা নিশ্চিত হই। আমি ইউএসটিসি পৌছাতে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। ইউএসটিসিমুখী শোকার্ত

মানুষের ঢল। প্রবেশ পথ থেকে কফিন পর্যন্ত ফুলে ফুলে ঢাকা। অসংখ্য শোকবাণী সম্মিলিত ব্যানারে ঢেকে গেছে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও ইউএসটিসির অন্যান্য স্থাপনা। দেশী বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ সবাই এসেছেন তাদের প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানাতে। অনেকে দেখলাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। হাসপাতালের সামনে শোকমঞ্চ থেকে শোকবাণী উচ্চারিত হচ্ছে। শোকার্ত জনতা সারিবদ্ধভাবে অ্যাম্বুলেন্সে রক্ষিত মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। শোকবই খোলা হয়েছে। শোক বইয়ে আমি লিখলাম- 'এমন জীবন হবে করিতে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন- ইসলাম স্যার মৃত্যুতে এই শাশ্বত বাণী আবার উপলব্ধি করলাম।' আরো দু'চার কথা লিখে আমি অ্যাম্বুলেন্সের কাছে গেলাম ইসলাম স্যারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে ইসলাম স্যারের সৌম্য মুখাবয়ব দর্শন করে অ্যাম্বুলেন্সের জানালায় মাথা স্পর্শ করে শেষ শ্রদ্ধা জানালাম। আর কিছুক্ষণ পরই তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হবেন তার মায়ের নামে স্থাপিত গুলমেহের হলের আঙিনায়, তাঁর সদ্যপ্রয়াত প্রিয়তমা স্ত্রীর কবরের পাশে। আমার মনে কেবল এ প্রশ্ন জাগছে-এত ভালোবাসা, এত উদারতা, এত মহানুভবতা, তার পরিণাম কি কেবল ঐ সাড়ে তিন হাত মাটি? কখনই নয়। জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে তিনি আজ পরপারের যাত্রী। কিন্তু তাঁর আদর্শ কালোত্তীর্ণ। তা যুগে যুগে প্রেরণার উৎস হিসাবে থাকবে এদেশের চিকিৎসক ও আপামর জনসাধারণের কাছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম যেখানেই উপস্থিত হয়েছেন সেখানেই অসংখ্য মানুষের পদভারে পরিবেশ মুখরিত হয়ে থাকতো। আজও তা-ই। তবে জীবদ্দশায় তিনি যে খ্যাতির শিখরে অবস্থান করে ছিলেন তার জন্যই হয়ত তাঁর উপস্থিতি মুখরিত থাকত। আজ তার খ্যাতির দৌরাত্ম্য দৃশ্যত নেই। তিনি আজ পরলোকের যাত্রী। কিন্তু রেখে গেছেন প্রীতি ও ভালোবাসা। এই প্রীতি খ্যাতির চেয়ে অনেক বড় এবং বেশি মহিমান্বিত। খ্যাতি জীবদ্দশায় সীমাবদ্ধ- প্রীতি অনন্ত। যে প্রীতির ডোরে, ভালোবাসার বন্ধনে তিনি চট্টগ্রাম ও দেশের মানুষ, এমনকি দেশের বাইরের মানুষকে আবদ্ধ করে গেছেন তা কালোত্তীর্ণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোগশয্যায় তার জীবনের শেষ দিনগুলোর উপলব্ধি লিখে গেছেন- 'আমি জানি যাব যবে সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি/ সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে/ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি/ ভালোবাসাই সত্য। এ জন্মের দান/ বিদায় নেবার কালে এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার'। এই ভালোবাসার শক্তিই আজ সবাইকে টেনে নিয়ে এসেছে। এই শক্তিতেই তিনি মানুষের মনে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর মৃত্যুকে অমরত্ব দান করবে।

CENTRAL LIBRARY
12980
Call no. 891.4